Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের সৌন্দর্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো পারভেজ

রোলঃ ২৩১০০১১০০৪৪

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের সৌন্দর্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো পারভেজ

রোলঃ ২৩১০০১১০০৪৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের সৌন্দর্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো পারভেজ, আইডিঃ ২৩১০০১১০০৪৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের সৌন্দর্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোঃ পারভেজ

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মো পারভেজ

আইডিঃ ২৩১০০১১০০৪৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

অধ্যায় ১: ইসলামের সৌন্দর্যের ধারণা: 9

অধ্যায় ২: সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায় : 11

অধ্যায় ৩: বিশুদ্ধ আকীদা বা তাওহীদ (বিশ্বাসে) ইসলামের সৌন্দর্য: 12

অধ্যায় ৪: ইবাদতের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সৌন্দর্য : 18

অধ্যায় ৫ : ইসলামে মানবাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার সৌন্দর্য: 21

অধ্যায় ৬ : ইসলামের অর্থনৈতিক ও ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য : 24

অধ্যায় ৭: আখলাক, চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য : 26

অধ্যায় ৮: ইসলামে সহনশীলতা ও ক্ষমার চরম সৌন্দর্য: 29

অধ্যায় ৯: ইসলামের সার্বজনীনতা সৌন্দর্য : 39

অধ্যায় ১০: ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য সৌন্দর্য: 42

অধ্যায় ১১: অমুসলিমদের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর আচরণ যেমন ছিল: 43

অধ্যায় ১২: মহানবী (সা.) বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ও ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য: 47

অধ্যায় ১৩: ইসালমে খেলাফতের সৌন্দর্য: 52

অধ্যায় ১৪: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদায় তার সৌন্দর্য: 57

অধ্যায় ১৫ :ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়ের অধিকার তার সৌন্দর্য: 65

অধ্যায় ১৬:মা বাবার সম্মান ও অধিকার তার সৌন্দর্য: 69

অধ্যায় ১৭ :ভাই-বোনের সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামের অনুপ্রেরণার সৌন্দর্য: 72

অধ্যায় ১৮ ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও সম্পর্কের সৌন্দর্য: 74

অধ্যায় ১৯ : ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার ও সৌন্দর্য: 77

অধ্যায় ২০: ইসলামে বন্ধুত্বের গুরুত্ব কতটা ও সৌন্দর্য: 89

অধ্যায় ২১: ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার এবং সৌন্দর্য: 90

অধ্যায় ২২: ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলতের সৌন্দর্য: 93

অধ্যায় ২৩: ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদবের সৌন্দর্য:..................................109

অধ্যায় ২৪: আমাদের করণীয় কিভাবে ইসলামের সৌন্দর্য আমরা ফুটিয়ে তুলবো : 122

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم و عل اله اصحا به اجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তিনি এক ও একক তাহার কোন শরিক নেই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের তিনি লালন-পালন করেন এবং দয়া করেন।

রহমত শান্তি বর্ষিত হোক পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবারের এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার রাস্তায় অপমানিত হয়েছেন তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছেন তার পরিবার তার স্বজন তার দেশ তার ঘর হারা হয়েছেন, তারপরও তিনি তাদের হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন তিনি চাইলে আল্লাহ তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসুল (সা.) তাঁর আজন্ম শত্রুদের যেভাবে ক্ষমা করেছিলেন,

তা ইসলামের উদারতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবীজি (সা.) অমুসলিমদের সাথে মানবিক আচরণ ও মহানুভবতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কারও ভুল বা মন্দ আচরণের জবাবে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া ইসলামের অন্যতম সুন্দর্য। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আমার জান মাল মা-বাবা স্ত্রী সন্তান সবকিছু কোরবান হোক।

ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করেছে। আসলে ইসলাম এত সুন্দর জীবন ব্যবস্থা যে নিরপেক্ষ কোন মানুষ মুগ্ধ না হয়ে থাকতেই পারবে না।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার পতিটা বিধান মানবজাতির জন্য পরম কল্যাণ ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। এর সৌন্দর্য কেবল ইবাদত বা আচার-অনুষ্ঠানের

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি জীবন দর্শন যা মানুষের ভেতর এবং বাহির উভয়কেই সুন্দর করে।

এবং দুনিয়াতেও আখেরাতেও সফলতা
দান করে।ধৈর্য ও সহনশীলতা রাগ বা হাশাতার মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। এটি মানসিক প্রশান্তি বয়ে আনে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তম ব্যবহার আখলাক এর মাধ্যমে তারা অমুসলিমদের সামনে ইসলামের মহান সৌন্দর্য তুলে ধরতেন যা দেখে শত শত মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

অতএব, এই থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে নিজেদের কথা ব্যবহার কাজ চলনে পরিবারে রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের মহান সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেন এবং বর্তমানে আমরা নিজেদের জীবনে কিভাবে
ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারি এবং আমাদের পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করতে পারি এবং অমুসলিমদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে পারি। আমরা যেন দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারি
আমরা এই থিসিস এর মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক ও বিষয়গুলা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমার মত একজন গুনাগার বান্দা যার কোন যোগ্যতাই নাই ইসলামের
মহান সৌন্দর্য নিয়ে লেখার।
আমাকে ক্ষমা করবেন। কেউ কখনো ইসলামের
সৌন্দর্য নিয়ে লিখে শেষ করতে পারেনি এবং পারবেও না।
আল্লাহ তার নগণ্য অযোগ্য বান্দাদের (IOM) মাধ্যমে আমাদের

স্টুডেন্টদের ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে একটি থিসিস লেখার সুযোগ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের সকল ওস্তাদদেরকে শুকরিয়া মনের গভীর থেকে আমাদেরকে আপনাদের দোয়ায় রাখবে। আল্লাহ সব সময় আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারি এবং ইসলামের অনুসরণ করতে পারি
নবীজির সব সুন্নাহ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং
আমাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন আমাদের সকলের গুনা ক্ষমা করুন জান্নাত দান করুন আমিন ।

অধ্যায় ১: ইসলামের সৌন্দর্যের ধারণা:

ইসলামের সৌন্দর্যের ধারণা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। এটি কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য নয় বা দৃষ্টিসুখকর কোনো বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং নান্দনিক বিষয় যা মানুষের জীবন ও স্রষ্টার সম্পর্কের সাথে সরাসরি যুক্ত।

আল্লাহ স্বয়ং সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।" (সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সমস্ত শৈল্পিক কারুকাজ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মূলত মহান স্রষ্টারই বহিঃপ্রকাশ।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সমন্বয়

ইসলামে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আত্মিক বিশুদ্ধতার ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মার্জিত পোশাক পরা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ইসলামের অন্যতম সুন্নাত। ইসলামে 'পবিত্রতা'কে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য: তাকওয়া (খোদাভীতি), বিনয়, ধৈর্য, ক্ষমা এবং সত্যবাদিতা হলো একজন মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য। সুন্দর অবয়বের চেয়ে সুন্দর চরিত্র ও সুন্দর মনের মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্রকে ইসলামের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যের সাথে সদাচরণ, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা এবং মানুষের উপকার করা ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য।

ইসলামের সৌন্দর্যের একটি বড় অংশ হলো হায়া বা লজ্জা। অতিরিক্ত বিলাসিতা বা অহংকার প্রদর্শনকে নিরুৎসাহিত করে শালীনতা ও সাধারণ জীবনযাপনের মাধ্যমে যে

সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, ইসলাম তাকেই উৎসাহিত করে। সৌন্দর্য মানেই অপচয় নয়, বরং যা কিছু সুশৃঙ্খল এবং ভারসাম্যপূর্ণ, তা-ই সুন্দর।

কুরআনে বারবার মানুষকে আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র এবং প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং স্রষ্টাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে। প্রকৃতির এই শৃঙ্খলা এবং নিখুঁত ভারসাম্য ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বিশাল শিল্পকর্ম।

ইসলামের সৌন্দর্য কেবল চোখ দিয়ে দেখার বিষয় নয়, বরং এটি অনুভব ও আচরণের বিষয়। যখন মানুষের বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা আর অন্তরের পবিত্রতা একসাথে মিলিত হয়, তখনই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যের পূর্ণতা পায়।

অধ্যায় ২: সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায় :

ইসলামে সৌন্দর্য বলতে কেবল বাহ্যিক রূপ বা দৈহিক আকর্ষণকে বোঝায় না, বরং এর মূল ভিত্তি হলো নৈতিকতা, চরিত্র, রুচিবোধ, আন্তরিকতা এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার পাশাপাশি উত্তম আচরণ এবং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সৌন্দর্য ।

ইসলামে পরিচ্ছন্নতাকে 'ঈমানের অর্ধেক' বলা হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল ও নখ পরিপাটি রাখা এবং নিজের চারপাশ সুন্দর রাখা সৌন্দর্যের অংশ। তবে এটি হতে হবে শালীনতার ভেতরে।

একজন মানুষের আসল সৌন্দর্য তার আচরণে ফুটে ওঠে। ক্ষমাশীলতা, নম্রতা, সত্যবাদিতা, বিনয় এবং অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।

বাহ্যিক রূপের চেয়ে আল্লাহ অন্তরের সৌন্দর্য ও তাকওয়া (আল্লাহভীতি) বেশি পছন্দ করেন। একটি হাদিসে এসেছে, আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক আকৃতি বা সম্পদ দেখেন না, বরং মানুষের অন্তর ও আমল দেখেন ।

মানুষের কাজ ও চিন্তায় যখন সততা, ন্যায়বিচার, মানবসেবা এবং কল্যাণকামিতা থাকে, তখন তার জীবন ও সমাজ উভয়ই সুন্দর হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে, ইসলামে সৌন্দর্য হলো বাহ্যিক সাজসজ্জা এবং অভ্যন্তরীণ সৎ গুণাবলির এক অপূর্ব সমন্বয়, যা একজন মানুষকে আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলে।

অধ্যায় ৩: বিশুদ্ধ আকীদা বা তাওহীদ (বিশ্বাসে) ইসলামের সৌন্দর্য:

বিশুদ্ধ আকীদা বা সঠিক বিশ্বাস ইসলামের মূল ভিত্তি এবং এর অন্যতম সৌন্দর্য ।যা মানবজীবনকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। এটি মানব জীবনে ঈমানের প্রাণশক্তি ও চেতনা সঞ্চারিত করে। আকীদা বিশুদ্ধ থাকলে আমল কবুল হয়, আর যদি আকীদা বিশুদ্ধ না হয়, তবে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক বিশ্বাস বা 'সহীহ আকীদা' কেবল পরকালীন মুক্তির পথই নয়, বরং দুনিয়াবী জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলার চাবিকাঠি।বিশুদ্ধ আকীদার মূল হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এটি মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। এটি সৃষ্টির প্রতি মানুষের ভয় ও ভক্তি কমিয়ে একমাত্র স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত করে, যা মানুষকে মানসিক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ দান করে। আল্লাহ্ বলেন নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য) বর্জন করো।" (সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৩৬)

আল্লাহ তা'আলাআরো বলেন,

''আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী''। (সূরা আয যারিয়াত: ৫৬-৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,
''তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো''। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৩)
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,
''আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো''। (সূরা আন-নাহাল: ৩৬)

তাওহীদকে প্রধানত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়:

১. তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ :

মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পরিচালনা, রিজিক প্রদান এবং জীবন-মৃত্যুর একক নিয়ন্তা হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করা

২. তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ :

সমস্ত ইবাদত, উপাসনা, দোয়া, ভয় এবং ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা। মানুষের কোনো কর্ম বা আকুতি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে না।

৩. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসে আল্লাহর যেসকল সুন্দর নাম এবং গুণাবলীর উল্লেখ আছে, সেগুলোকে কোনো প্রকার বিকৃতি, সাদৃশ্য বা তুলনা ছাড়াই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা।

১. তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের সৌন্দর্য :

তাওহীদে রুবুবিয়্যাত হলো—মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পরিচালনা, রিজিক প্রদান, জীবন-মৃত্যু এবং এর প্রতিটি নিয়মের একক নিয়ন্ত্রক ও মালিক হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করা। এই বিশ্বাসের সৌন্দর্য মানুষের চিন্তাজগৎ ও জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করে:

২.মহাজাগতিক সুশৃঙ্খলা ও একতার সৌন্দর্য: বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিতে তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের সৌন্দর্য অনস্বীকার্য। পরমাণুর ভেতরের অণুজীব থেকে শুরু করে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি—সবই একটি সুনির্দিষ্ট এবং অভিন্ন গাণিতিক নিয়মে বাঁধা। পবিত্র কুরআন এই মহাজাগতিক একতাকে তাওহীদের প্রধান যৌক্তিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে:

"যদি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২২)

যদি মহাবিশ্বের একাধিক পরিচালক থাকত, তবে তাদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের সংঘাতের কারণে প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে যেত। এই নিখুঁত শৃঙ্খলা প্রমাণ করে যে এর পেছনে একজন মাত্র পরম প্রজ্ঞাময় সত্তার একক পরিকল্পনা কাজ করছে।

৩.মানুষের মন থেকে ভয় ও হীনমন্যতা দূরীকরণ: প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সূর্য, চন্দ্র, আগুন বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়ে এসেছে।

তাওহীদে রুবুবিয়্যাত মানুষকে শেখায় যে, মহাবিশ্বের কোনো সৃষ্টির নিজেরই কোনো লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। যখন একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে তার জীবন, মৃত্যু এবং রিজিক একমাত্র আল্লাহর হাতে, তখন তার মন থেকে সমস্ত জাগতিক ভয় দূর হয়ে যায়। সে কোনো স্বৈরাচারী শাসক বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে মাথা নত করে না।

৪. তাওয়াক্কুল ও মানসিক প্রশান্তি: আধুনিক যুগে মানুষের মানসিক সংকটের অন্যতম কারণ হলো ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। রুবুবিয়্যাতের বিশ্বাস মানুষকে 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শেখায়। একজন মুমিন জানে, তার জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনার অংশ, যা আপাতদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তার কল্যাণের জন্যই হয়।

২.১) তাওহীদে উলুহিয়্যাতের সৌন্দর্য :

তাওহীদে উলুহিয়্যাত (বা তাওহীদে ইবাদত) হলো—সমস্ত ইবাদত, উপাসনা, দোয়া, আনুগত্য, ভয় এবং ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা। মানুষের কোনো কর্ম, সেজদা বা আকুতি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হতে পারে না। এর সৌন্দর্যগুলো হলো:

২. মানবাত্মার পরম মুক্তি ও দাসত্বহীনতা: সাধারণত মানুষ মনে করে কোনো নিয়মের অধীনে আসা মানে স্বাধীনতা খর্ব হওয়া। কিন্তু তাওহীদে উলুহিয়্যাতের সৌন্দর্য এখানেই যে, এটি মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার সাথে যুক্ত করে। মানুষ যখন কেবল এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করে, তখন সে দুনিয়ার বাকি কোটি কোটি সৃষ্টির দাসত্ব থেকে একবারে মুক্তি পেয়ে যায়।

তাকে আর কোনো মাজার, পীর, কোনো মানুষ বা কাল্পনিক শক্তির সন্তুষ্টির জন্য হাত পাততে হয় না।

৩. সামাজিক সমতা ও বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব: উলুহিয়্যাতের প্রভাবে মানবসমাজে এক অভূতপূর্ব সমতা তৈরি হয়। যেহেতু ইবাদত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ, তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ সমান। এখানে রাজা এবং প্রজা, ধনী এবং দরিদ্র, মালিক এবং কর্মচারী একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ের সুযোগ পায়। বংশ, জাতি বা গায়ের রঙের কারণে কেউ আল্লাহর দরবারে আলাদা প্রটোকল পায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন:
"হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন (আদম)। জেনে রেখো, কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, কিংবা কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই... কেবলমাত্র তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ছাড়া।" (মুসনাদে আহমাদ)

৪. ইখলাস বা নিয়তের বিশুদ্ধতা: উলুহিয়্যাত মানুষের অন্তরে 'ইখলাস' (আন্তরিকতা) তৈরি করে। একজন মানুষ যখন জানে যে তার ভালো কাজের প্রতিদান মানুষ নয়, বরং আল্লাহ দেবেন, তখন সে লোকদেখানো (রিয়া) মানসিকতা থেকে মুক্ত থাকে। তার গোপন ও প্রকাশ্য জীবন একই রকম পবিত্র হয়ে ওঠে।

৩.১) তাওহীদে আসমা ওয়াস-সিফাতের সৌন্দর্য :
তাওহীদে আসমা ওয়াস-সিফাত হলো—পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসে আল্লাহর যেসকল সুন্দর নাম (যেমন: রহমান, রহীম, আল-আদল, আল-গাফুর) এবং গুণাবলীর উল্লেখ আছে, সেগুলোকে কোনো প্রকার বিকৃতি, মানবীয় তুলনা বা অস্বীকার করা ছাড়াই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। এর সৌন্দর্য নিম্নরূপ:

২. দয়া ও ক্ষমার চাদর (হতাশা দূরীকরণ): ইসলামে আল্লাহর গুণাবলীর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তাঁর পরম দয়ায়। বান্দা যতই পাপ করুক না কেন, আল্লাহর দয়ার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।" (সূরা আয-যুমার: ৫৩)
আল্লাহর 'আল-গাফুর' (ক্ষমাশীল) ও 'আর-রহমান' (দয়াময়) গুণাবলী মানুষকে ডিপ্রেশন বা চরম পাপের পরও জীবনে ফিরে আসার আলো দেখায়।

৩. পরম ন্যায়বিচার (সামাজিক সুশাসনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি): দয়ার সমান্তরালে আল্লাহ হলেন 'আল-আদল' বা পরম ন্যায়বিচারক। এই বিশ্বাসটি সমাজে অপরাধ দমনে একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল হিসেবে কাজ করে। একজন অপরাধী যখন জানতে পারে যে দুনিয়ার আদালতে সে ক্ষমতার জোরে পার পেয়ে গেলেও আল্লাহর একক ও নিখুঁত আদালতে তাকে প্রতিটা অন্যায়ের জবাব দিতে হবে, এবং একজন মজলুম যখন জানে সে দুনিয়ায় বিচার না পেলেও আখিরাতে পূর্ণ বিচার পাবে, তখন সমাজে এক ধরণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয়।

৪. আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত ও জীবন্ত সম্পর্ক: আল্লাহর ৯৯টি সুন্দর নাম মানুষের সাথে তাঁর একটি জীবন্ত সম্পর্ক তৈরি করে। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সে 'আল-মুজীব' (দোয়া কবুলকারী) নামে ডাকে, যখন অভাবে পড়ে তখন 'আর-রাজ্জাক' (রিজিকদাতা) নামে ডাকে, আর যখন একা বোধ করে তখন 'আল-ওয়াদুদ' (ভালোবাসার আধার) নামে আল্লাহকে স্মরণ করে। এটি মানুষের আত্মাকে এক অদ্ভুত নিরাপত্তা ও পরম শান্তি দান করে।

তাওহীদের প্রভাব :
তাওহীদ কেবল একটি তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়, এটি সামাজিক বিপ্লবের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। মানবসমাজে যত প্রকার বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং দাসত্ব তৈরি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে মানুষকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবার মানসিকতা।
বর্ণবাদ ও বংশীয় অহংকারের চূড়ান্ত বিলোপ: যখন পুরো সমাজ এই বিশ্বাসে একতাবদ্ধ হয় যে—সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রমাণিত হয় যে সমস্ত সৃষ্টির উৎসও এক। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী সমতার ঘোষণা দিয়েছিলেন:

"হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন (আদম)। জেনে রেখো, কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, কিংবা কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একইভাবে কালোর ওপর সাদার বা সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—কেবলমাত্র তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ছাড়া।" (মুসনাদে আহমাদ)

মানবিক মর্যাদার একীকরণ: তাওহীদ মানুষকে শেখায় যে মানুষের আসল মূল্য তার ব্যাংক ব্যালেন্স, গায়ের রঙ বা রাজকীয় বংশে নয়, বরং তার ভেতরের পবিত্রতা ও চরিত্রে। এই বিশ্বাসের কারণে রাজা এবং প্রজা, ধনী এবং দরিদ্র একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ের সাহস ও সুযোগ পায় ।

অধ্যায় ৪: ইবাদতের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সৌন্দর্য :

ইসলামে 'ইবাদত' শব্দটির পরিধি কেবল কিছু যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান বা রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি হলো স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির পরম ভালোবাসা, গভীর আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণের এক জীবন্ত প্রকাশ। ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের একটি বাহ্যিক কাঠামোর পাশাপাশি অত্যন্ত গভীর একটি অভ্যন্তরীণ, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক সৌন্দর্য রয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান যেখানে মানুষের মানসিক প্রশান্তির জন্য বিভিন্ন থেরাপি বা মেডিটেশনের কথা বলে, ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক ও মানসিক নিরাপত্তার সেই স্থায়ী সমাধান দিয়ে রেখেছে। ইসলামের প্রধান চারটি স্তম্ভ বা ইবাদতের ভেতরের এই নান্দনিক সৌন্দর্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. সালাত (নামাজ): দৈনিক প্রশান্তি ও মানসিক সুরক্ষাকবচ

ইসলামের প্রধান ইবাদত সালাত হলো একজন বান্দার সাথে তার সৃষ্টিকর্তার সরাসরি কথোপকথন ও সংযোগ। এর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য অপরিসীম:

মানসিক চাপ ও উদ্বেগ মুক্তি: আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষ প্রতিনিয়ত নানামুখী মানসিক চাপে ভোগে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একজন মানুষকে দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল ও ব্যস্ততা থেকে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর দরবারে নিয়ে যায়। সিজদার মাধ্যমে বান্দা যখন তার সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও আকুতি আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়, তখন সে এক অদ্ভুত হালকা অনুভূতি ও পরম মানসিক নিরাপত্তা লাভ করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন:

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" — (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

সমতা ও শৃঙ্খলার সৌন্দর্য: জামায়াতে (একত্রিত হয়ে) সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। এখানে কোনো সামাজিক বৈষম্য বা ভিআইপি কালচার নেই। এই দৃশ্য মানব ভ্রাতৃত্বের এক অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে এবং মানুষের মন থেকে অহংকার দূর করে।

২. সিয়াম (রোজা): আত্মশুদ্ধি ও ধৈর্যের নান্দনিকতা

রমজান মাসের সিয়াম সাধনা কেবল উপবাস থাকা নয়, এটি হলো মানুষের আত্মার এক অনন্য ও সুন্দর প্রশিক্ষণ:

ইচ্ছাশক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও, ঘরের কোণে একা থাকলেও কেবল আল্লাহর ভালোবাসায় ও নজরদারির ভয়ে মানুষ খাবার স্পর্শ করে না। এই চর্চা মানুষের ভেতরের পশুবৃত্তিকে দমন করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। রাসেলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"রোজা হলো একটি ঢালস্বরূপ।" — (সহীহ বুখারী)

অর্থাৎ, এটি মানুষকে পাপাচার ও মানসিক পতন থেকে রক্ষা করার এক আধ্যাত্মিক দেয়াল।

সহানুভূতির সৌন্দর্য: সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনী ব্যক্তিরা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অনাহারের কষ্ট বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলে মানুষের মনে মানবতাবোধ, দয়া এবং দানশীলতার এক অনন্য স্পৃহা তৈরি হয়, যা সমাজকে সুন্দর করে তোলে।

৩. যাকাত: সম্পদের পবিত্রতা ও সামাজিক ভারসাম্য

যাকাত হলো ইসলামের একটি অনন্য অর্থনৈতিক ইবাদত। এর মূল সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে এর নামকরণের মাঝেই—'যাকাত' শব্দের অর্থই হলো পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি।

হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূরীকরণ: যাকাত মানুষের মন থেকে কৃপণতা, স্বার্থপরতা এবং অতিরিক্ত ধনলিপ্সা দূর করে হৃদয়কে উদার করতে শেখায়। এটি ধনীকে মনে করিয়ে দেয় যে তার সম্পদে দরিদ্রের অধিকার রয়েছে।

সম্পদের নিরাপত্তা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি: ধনী ব্যক্তি যখন নিজের উপার্জিত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রকে খুশি মনে দান করে, তখন দরিদ্রের মনে ধনীর প্রতি কোনো হিংসা বা ক্ষোভ থাকে না, বরং এক পরম ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। এটি সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও চুরি-ডাকাতি কমায় এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৪. হজ: বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও অহংকার মুক্তি

হজ হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক সম্মেলন, যেখানে আক্ষরিক অর্থেই ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়:

আভিজাত্যের বিলুপ্তি: পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন ভাষার এবং বিভিন্ন বর্ণের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের রাজকীয় বা দামি পোশাক ত্যাগ করে একই রকমের সাধারণ সাদা দুই টুকরো কাপড় (এহরাম) পরিধান করে। এখানে সবাই আল্লাহর দরবারে সমান ভিখারি। মানুষের ভেতরের আভিজাত্যের অহংকার চূর্ণ করার এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

বর্ণবাদের অবসান: আধুনিক বিশ্ব যখন বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের সংকটে জর্জরিত, হজ তখন শেখায় যে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন:

"কোনো আরবের ওপর অনারবের, কিংবা অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া (খোদাভীতি)।" — (মুসনাদে আহমাদ)

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদত মানুষের মন, শরীর এবং সমাজকে এক সুতোয় গেঁথে রাখে। নামাজ মানুষকে দেয় দৈনিক মানসিক শৃঙ্খলা, রোজা দেয় আত্মিক শক্তি ও ধৈর্য, যাকাত আনে সামাজিক নিরাপত্তা এবং হজ দেয় বিশ্বজনীন একতা। এই ইবাদতগুলোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে কোনো কষ্টে ফেলা নয়, বরং মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে তাকে এক পরম প্রশান্তিময় জীবনের স্বাদ দেওয়া। আর এটাই হলো ইসলামের ইবাদত কাঠামোর আসল নান্দনিক সৌন্দর্য।

অধ্যায় ৫ : ইসলামে মানবাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার সৌন্দর্য:

ইসলামের অন্যতম প্রধান সৌন্দর্য হচ্ছে, ইসলাম মানবাধিকারের সীমাকে এত প্রশস্ত করেছে যে, পুরো জীবন এর মাঝে এসে পড়ে। পিতা-মাতার হক, বন্ধু-বান্ধবের হক, শ্রমিক-মালিক এবং শাসক ও জনগণের হক, সরকারের হক, শ্রমজীবী মানুষদের হক, দুর্বল ও অসহায়দের হক, সাধারণ মুসলমানের হক, সাধারণ মানুষের হক ইত্যাদি।

শুধু মানুষেরই নয় ইসলাম চতুষ্পদ জন্তু ও অবলা প্রাণীর অধিকারও নিশ্চিত করেছে। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, বান্দার হক এবং আল্লাহর হক আদায় করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

ইসলামের আরেক সৌন্দর্য হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে অধিকার আদায়ের চেয়ে অধিকার প্রদানের বিষয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে। বর্তমান সমাজের বড় একটি দুর্বলতা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারের তালিকা হাতে নিয়ে তা আদায়ের স্লোগান দেয়। কিন্তু অন্যদের যেসকল হক তার উপর রয়েছে তা আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গাফেল।

যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার উসুলে ব্যস্ত থাকবে কিন্তু অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে থাকবে গাফেল তখন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা হবে তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল, যা বর্তমান পৃথিবীতে একেবারেই স্পষ্ট। ইসলাম প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গুরুত্বের সাথে অন্যের হক ও অধিকার আদায়ের অনুভূতি জাগ্রত করে। কারণ, কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম শুধুই আইন ব্যবহার করে না; বরং মানুষের হৃদয়ে এমন বোধ ও চেতনা জাগ্রত করে, যা ব্যক্তির মাঝে দায়িত্ব পালনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে। ফলে শুধু আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা ও অসন্তুষ্টির ভয় এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহিতার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে নিজ থেকে সকলের হক ঠিক ঠিকভাবে আদায় করে দেয়।

ইসলাম বলে, দুনিয়াতে কেউ যদি অন্যের কোনো ক্ষতি করে তাহলে কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু-পরমাণুর হিসাব নেয়া হবে; কড়ায় গন্ডায় সকল হক শোধ করতে হবে। এমনকি কোনো শিংওয়ালা বকরি যদি শিং ছাড়া বকরিকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন উভয়কে জীবিত করে শিংহীন বকরির বদলা দেয়া হবে। যখন বিবেকহীন প্রাণীদের মাঝে পর্যন্ত ইনসাফ করা হবে, প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে তাহলে যেসকল মানুষ সজ্ঞানে ও জাগ্রত বিবেকে অন্যের হক আত্মসাৎ করেছে তাদের সাথে কেমন আচরণ হবে?
নারীদের কী কী অধিকার পুরুষের উপর আছে সে ব্যাপারে ইসলাম পুরুষদের সচেতন করে; কিন্তু নারীদেরকে অধিকার আদায়ের নামে রাস্তায় নামার উস্কানি দেয় না। স্ত্রীদেরকে স্বামীর হকের কথা মনে করিয়ে দেয়; স্বামীকে নিজ হক আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করতে বলে না। ইসলাম শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দেয়ার জন্য মালিককে উৎসাহিত করে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ ছেড়ে রাস্তায় ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে প্ররোচিত করে না।

মোটকথা ইসলামে প্রতিটি মানুষকে তার উপর অন্যের যে হক রয়েছে তা আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক ঠিক ঠিক আদায় করছে কি না সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। এভাবে ইসলাম পুরো দেশ ও পুরো সমাজকে একশ ভাগ অধিকার প্রদানকারী হিসাবে দেখতে চায়। অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে শতভাগ সরব কিন্তু অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি নীরব- সমাজের এ দৃশ্য ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান সমাজে যে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা যাচ্ছে তা ইসলামের এ শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিমুখ হওয়ারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল।

মোটকথা ইসলাম তার পবিত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকারকে এ পরিমাণ সংরক্ষণ করেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ্র তুলনায় হক্কুল ইবাদকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, কারো মনে যেন অন্যের হক নষ্ট করার চিন্তাও না থাকে। ভুলবশত কারো হক নষ্ট হয়ে গেলে তা শোধরানো পর্যন্ত মনে শান্তি না আসে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মানুষের অধিকার আদায়ে ছিলেন শতভাগ সচেতন। তাই তাঁদের যুগে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার যে দৃশ্য পৃথিবী দেখেছে মানব ইতিহাসে আজ আমরা এর নমুনা পেশ করতে অক্ষম। বর্তমান সময়ে নিজ দায়িত্ব পালনে ও অন্যের অধিকার প্রদানে মুসলমানদের মাঝে যে শিথিলতা দেখা যায় তা মূলত ইংরেজ-সভ্যতা ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের চিন্তানৈতিক দাসত্বের প্রভাব। এই অভিশপ্ত সভ্যতার প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে দ্বীনী ব্যাপারে শিথিলতা শুরু হওয়ার পর থেকে বিভেদ, ধর্মহীনতা ও অন্যের প্রাপ্য না দেয়াকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করা শুরু হয়েছে ।

অধ্যায় ৬ : ইসলামের অর্থনৈতিক ও ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য :

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো সুবিচার ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি কল্যাণমুখী কাঠামো। এটি মানুষের বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সামাজিক ইনসাফ নিশ্চিত করে। সম্পদের কেন্দ্রীভবন রোধ, দরিদ্রদের অধিকার সুরক্ষা এবং হালাল উপায়ে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনই এর মূল লক্ষ্য।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার মৌলিক সৌন্দর্য এবং ইনসাফভিত্তিক কাঠামোর প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. মালিকানার ভারসাম্য:
ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি থাকলেও ইসলামে সবকিছুই মূলত আল্লাহর আমানত। মানুষ কেবল এর তত্ত্বাবধায়ক। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ নেই, বরং তা সমাজের কল্যাণে উন্মুক্ত ও প্রবাহমান থাকতে হয়।

২. যাকাত ও সম্পদের পুনর্বণ্টন:
যাকাত হলো ইসলামি অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান দূর করে সামাজিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

৩. সুদমুক্ত সমাজ (রিবা নিষিদ্ধকরণ):
ইসলামে সুদ (রিবা) সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে, কারণ এটি সম্পদের অসম বণ্টন ও শোষণ তৈরি করে। এর বিপরীতে লাভ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়।

৪. ন্যায়ভিত্তিক লেনদেন:
অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সততা, স্বচ্ছতা এবং ইনসাফ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। মুনাফার একটি যৌক্তিক সীমা থাকা উচিত। মজুদদারি, ফটকাবাজি (জুয়া) এবং প্রতারণামূলক সব ধরনের লেনদেন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৫. দান ও ওয়াকফ ব্যবস্থা:

যাকাতের পাশাপাশি সাদকা (ঐচ্ছিক দান) এবং ওয়াকফ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের স্থায়ী উন্নয়ন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।

অধ্যায় ৭: আখলাক, চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য :

ইসলামে আখলাক বা নৈতিক চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ অলংকার। মুমিনের পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও সফলতার মূল ভিত্তি হলো উত্তম চরিত্র। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক থেকে যে সর্বোত্তম, সে-ই ঈমানের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ।

নবী করীম (সা) বলেন, আমাকে সচ্চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তেই প্রেরণ করা হয়েছে।

মানব জীবনে আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ তার মনের আলোকেই সম্পাদিত হয়। ঈমাম গাজ্জালীর মতে-যেমন গুণাবলী মানব মনে জাগ্রত থাকে তারই প্রতিফলন তার বাহ্যিক কাজ-কর্মে প্রকাশিত হয়। এর আলোকে বলা যায় মানুষের কোনো কাজই তার মূল চিন্তা-চেতনা বহির্ভূত নয়। এ জন্যই যুগে যুগে নবী রাসূল এবং ইমামরা মানুষের সংশোধন ও পবিত্র জীবন যাপনের পন্থা হিসেবে তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি ও মূল্যবোধের জ্ঞান প্রথমেই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, মান-সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের মানসিক বিকাশ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপরই নির্ভর করে।

উত্তম চরিত্র ইসলামী শিক্ষার অন্যতম একটি কোর্স হিসেবে পরিগণিত করা হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র মানব সমাজের চারিত্রিক উন্নয়নে প্রচুর নির্দেশনা বিদ্যমান। মূলত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এ চরিত্রের আলোকেই হয়ে থাকে।

আখলাকের মাধ্যমেই মানুষ মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত মানে উন্নীত হতে পারে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। এ বিধানের পরিপূর্ণতার জন্য তাতে উন্নত চরিত্রের বিধান থাকা আবশ্যক।

তাই ইসলামে আখলাকুল হাসানাহ্ তথা উত্তম চরিত্রের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্তে আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রসূলদের প্রেরণ করেছেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সা) কে প্রেরণের অন্যতম কারণ সচ্চরিত্রের বিকাশ সাধন। একদা জনৈক ব্যক্তি রসূল (সা) কে দ্বীনের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, উত্তম চরিত্র। এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, সচ্চরিত্রতা বা উত্তম চরিত্র দ্বীনের অন্যতম একটি রুকন, যা ব্যতীত দ্বীনের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না, যেমন হজ্ব সম্পর্কে রাসূলের বাণী- হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন হচ্ছে আরাফায় অবস্থান করা যা ব্যতীত হজ্ব আদায় হয় না, তেমনি সচ্চরিত্রতা ব্যতীত দ্বীন ও পরিপূর্ণ হয় না।
উত্তম চরিত্র হল পরকালে মুক্তির উপায়, ইসলামের অপরিহার্য ফরজ তথা নামাজ-রোযা পালন করা সত্ত্বেও পরকালে জাহান্নাম থেকে নাজাত ও জান্নাত লাভের জন্য আখলাক তথা উত্তম চরিত্রের কোনো বিকল্প নেই।

একদা এক ব্যক্তি রসূল (সা) কে নামাজি ও রোজাদার হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীদের কষ্টদানকারিণী জনৈকা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী'। এমনকি মু'মিনদের মান ব্যবধান হবে উত্তম চরিত্র দ্বারা।

জনৈক ব্যক্তি রসূল (সা)-কে উত্তম ঈমানদার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'তাদের মধ্যে যে অধিক চরিত্রবান সেই উত্তম'। উত্তম চরিত্র দ্বারা মু'মিনরা কিয়ামতে রাসূল (সা)-এর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সবাই এক রকম হবে না।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, 'কিয়ামতের দিবস তোমাদের মধ্যে আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় ও অবস্থানের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী হবে তোমাদের মধ্যে যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী'।কিয়ামতের মাঠে হিসেব-নিকাশের সময় আ-ল্লাহ ভীতি ও সৎ চরিত্রের অধিকারীর আমলনামাও ভারী হবে।

রাসূল (সা)-এর উত্তম আখলাক সম্পর্কে দোয়া করতেন, তিনি নিজে গুণাহমুক্ত হয়েও নিজের চরিত্র সুন্দর করার তৌফিক অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। যেমন তিনি দোয়ায় বলতেন, আল্লাহ তুমি আমার গঠন-আকৃতি সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

আল্লাহ তায়ালা রসূল (সা) এর উত্তম চরিত্রের প্রশংসাও করেছেন, তিনি বলেন, ‘আপনি মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত’। (সুরা কলম : ৪)

আয়াতে মহান আল্লাহ কর্তৃক রসূল (সা)-এর আখলাকের প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রচুর আয়াতে আখলাকের বিবরণ ও চরিত্রবানদের প্রশংসার বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, মাক্কী ও মাদানী উভয় সূরাগুলোতে আখলাকের নির্দেশ বেশি থাকায় এর গুরুত্বেরও আধিক্য বুঝা যায়, যা থেকে কোনো মুসলিমের দূরে থাকা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার রাসূল (সা)-এর উত্তম চরিতে চরিত্রবান করুন। আমিন।

অধ্যায় ৮: ইসলামে সহনশীলতা ও ক্ষমার চরম সৌন্দর্য:

ক্ষমা এবং সহনশীলতা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি সর্বোত্তম আচরণের মধ্যে রয়েছে যার জন্য তিনি সর্বদা পরিচিত। নবীজীর সারাজীবনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যখন তিনি অন্যদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে একই রকম হত না। এ কারণেই নবীর এই নম্র আচরণ থেকে মুসলমানদের একটি বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যদি তিনি এই আচরণ না করতেন, তাহলে এমন একটি সুযোগ ছিল যে নবীর লোকেদের হৃদয়ে এমন বিশেষ স্থান তৈরি করা সহজ হতো না যেভাবে তিনি আজ করেছেন। পবিত্র কুরআন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই পদ্ধতির উল্লেখ করে বলেছেন:

(আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন।) (পবিত্র কুরআন: ১৫৯/০৩)।

পবিত্র কোরআনে ক্ষমা ও ক্ষমার পদ্ধতি সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা মানুষের পাপ মোচনে আল্লাহর অপার করুণা এবং পারস্পরিক ক্ষমার গুরুত্ব তুলে ধরে।

১.আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার)

সুরা আয-যুমার, আয়াত ৫৩: "বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"

সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫: "তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?..."

২.পারস্পরিক ক্ষমা ও উদারতা

সুরা আশ-শুরা, আয়াত ৪৩: "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরবে ও ক্ষমা করবে, সন্দেহাতীতভাবে এটা বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।"

সুরা আন-নূর, আয়াত ২২: "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য না করার

শপথ না নেয়। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

৩.ক্ষমার পদ্ধতি ও উত্তম আচরণ:

সুরা আল-আরাফ, আয়াত ১৯৯: "তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো।"

সুরা আল-হিজর, আয়াত ৮৫: "সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে ক্ষমা করো।"

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সবসময় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে উৎসাহিত করেছেন।

৪.ফাতহ মক্কা বিজয় :

আল্লাহুর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহনশীলতা ও ক্ষমার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল ফাতাহ মক্কা।

ফাতহ মক্কায় কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে, মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যাত্রার কারণ কী ছিল তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। এটি হিজরি ক্যালেন্ডারের সপ্তম বছরের শেষের সময় ছিল যখন কুরাইশ এবং তাদের মিত্র বাণী বাকাররা হুদাইবিয়ার চুক্তিতে মুসলমানদের সাথে মিত্রতাকারী বনী খুজাইমাকে আক্রমণ করে শান্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছিল। চুক্তি অনুসারে, উভয় গ্রুপের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার কথা ছিল এবং যদি দৈবক্রমে কিছু চুক্তির শান্তি নির্দেশনা না মেনে চুক্তি লঙ্ঘন করে, তবে অন্য পক্ষ তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেবে। একইভাবে, বাণী খুজাইমা শান্তি ও সুরক্ষার জন্য নবীর কাছে এসেছিল। কাফেরদের দ্বারা এবং বিশেষ করে মক্কার মুশরিকদের দ্বারা পরিচালিত এই অন্যায় ও অত্যাচারের ধারার অবসান ঘটানোর অনুভূতি সেখান থেকেই আসে। এখন, নবী দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী একত্র করে এই অন্যায় ও মূর্তিপূজার লোকদের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করলেন। এই কারণেই মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।

ফাতহ মক্কায় কী ঘটেছিল?

এটি ছিল রমজান মাসে, যখন নবী (সা) দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে ৮ম হিজরীতে ১০ই রমজান মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তারা 'মার-উজ-জাহরান'-এ পৌঁছানোর পরে, তারা সেখানে তাদের শিবির স্থাপন করে এবং নবী পরবর্তীতে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কারণ সেখান থেকে এটি মাত্র একদিনের যাত্রা ছিল। সামরিক

কৌশলের অংশ হিসেবে, নবী সৈন্যবাহিনীকে চুলার মতো আলো জ্বালানোর জন্য বলেছিলেন যাতে বিরোধীরা এটিকে দেখে ভয়িয়ে যায় কারণ এটি মাইল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই কৌশলটি খুব ভালভাবে কাজ করেছিল যখন আবু সুফিয়ান (র.) কুরাইশদের দ্বারা অর্পিত 'মার-উজ-জাহরান'-এ পৌঁছেছিলেন, যাতে নবীকে তার প্রকল্পটি ত্যাগ করতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মদীনায় ফিরে যেতে বলেন। এটা দেখে তিনি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করলেন এবং নবী তাকে অনুমতি দিলেন। সাক্ষাতের সময় নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবু সুফিয়ান, তুমি কি একথা স্বীকার করার সময় আসেনি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন খুদা নেই এবং আমি তাঁর রাসূল?" একথা শুনে আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণের জন্য ইতস্তত করলেও তিনি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তাকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরের সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নবীজি তিনার প্রিয় উট আল-কাসওয়ায় কালো রঙের পাগড়ি নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, উসামা ইবনে যায়েদ তিনার পিছনে বসেছিলেন। প্রবেশের সময়, নবী সূরা আল-ফাতাহ-এর এই কয়েকটি আয়াত পাঠ করেছিলেন: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।) (পবিত্র কুরআন: ৪৮/১-৩)

এমন উদার মনোভাব নিয়ে মুসলিম বাহিনী তাদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। আরবদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, কোন বাড়িতে ডাকাতি হয়নি এবং সকল নারী-পুরুষের সম্মান ও সতীত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, নবী মক্কার সমগ্র জনসংখ্যার জন্য একটি সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন এই বলে: "আশ্রয় সেই ব্যক্তির জন্য যে তার অস্ত্র রাখে; আশ্রয় হল সেই ব্যক্তির জন্য যে তার দরজা বন্ধ করে দেয়; যে ব্যক্তি পবিত্র কাবাঘরে প্রবেশ করবে তার জন্য আশ্রয়স্থল।

যাইহোক, নবী সাহাবীদেরকে পূজার সমস্ত মূর্তি ও পৌত্তলিক মূর্তি ধ্বংস করতে বলেছিলেন। এই আদেশে, পবিত্র কাবাঘরে থাকা প্রায় ৩৫০ মূর্তি ফেলে দেওয়া হয়। কাবার ছাদ থেকে ঝুলে থাকা একটি কাঠের কবুতরকে নবী নিজেই ধ্বংস করেছিলেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কাবা পবিত্র করার পর এবং নামাজ

আদায় করার পর, তিনি হাজার হাজার কাফের ও মুশরিকদের বিশাল জনতার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন যাদের মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রধান। ভয় ও আতঙ্কে কাঁপতে থাকা তাদের দিকে এক নজর দেখে, নবী সমবেত লোকদের কাছে একটি খুতবা প্রদান করেন যাতে তিনি কুরআনের শব্দে ভ্রাতৃত্বের মর্মকে স্পষ্ট করে বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।) (পবিত্র কুরআন: ৪৯/১৩)

অতঃপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অত্যাচারীদের দিকে ফিরে গেলেন, যাদের মধ্যে পথের কাঁটা বিছিয়েছিল, পাথর নিক্ষেপ ও তিনার হত্যার ষড়যন্ত্রকারী, সাইয়্যেদুনা জয়নাবের আক্রমণকারী, নবীর চাচা সাইয়্যেদুনা হামযার হত্যাকারী এবং আরো অনেকে ছিলেন, এবং বললেন: 'হে কুরাইশ! আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব, তোমরা কি মনে করো?' তারা সব মিলিয়ে মৃদু জবাব দিল: 'আমরা আশা করি আপনি আমাদের সাথে ভাল আচরণ করবেন।' একথা শুনে নবী (সাঃ) সেই সোনালী কথাগুলো বললেন এবং বছরের পর বছর যা কষ্ট সহ্য করেছেন সব ক্ষমা করে দিয়ে বললেনঃ 'আজ আমি তোমাদেরকে সেই কথাই বলবো যা আমার ভাই ইউসুফ আলাইহি সালাম তার ভাইদের বলেছিল।' এর দ্বারা নবীর অর্থ হল বিচারের দিন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তার পক্ষ থেকে নবী তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ফাতহ মক্কার পর ইসলামের প্রসার

নবীজির এই মনোভাব জানার পর সেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের আগমন ঘটে। এই সমস্ত মুসলমান তাদের সাথে নবীর কার্যকরী ও সহানুভূতিশীল আচরণের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের কাউকেই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি যেমনটা কিছু ইসলাম বিদ্বেষী বলে। এই সদ্য প্রত্যাবর্তিত মুসলমানরা সাফা পাহাড়ে শপথ গ্রহণ করেছিল যেখানে লোকেরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা পরবর্তীতে কোন দেবতার পূজা করবে না, তারা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করবে এবং চুরি, ব্যভিচার, শিশুহত্যা, মিথ্যা, গীবত এবং ইসলাম যে সকল অপকর্ম নিষিদ্ধ করেছে তা থেকে বিরত থাকবে।

মক্কায় এই সময়কালে, নবী তিনার শিষ্যদেরকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠান যেখানে ইসলামের আলো তখনও জ্বলেনি। তাই, তারা বন্য উপজাতি এবং মরুভূমির লোকদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিল এবং তাদের ইসলামের প্রকৃত চেতনা এবং ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের শিক্ষা ও নীতি থেকে তাদের জীবনে এর প্রভাব কী হতে পারে তা বুঝতে সাহায্য করেছিল। শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের এই সমস্ত অভিযান যখন মক্কা ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইসলামে বিশ্বাসীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আজও রাসূলের এই প্রভাবশালী মনোভাবকে এত বেশি সংখ্যায় ইসলাম প্রচারের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আল্লাহ আমাদের দ্বীনকে সর্বোচ্চ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর শিক্ষায় অটল থাকার তৌফিক দান করুন: আমীন।

৫.তায়েফবাসীর প্রতি ক্ষমা :

তায়েফবাসীর প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষমার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে ক্ষমার এক অনন্য ও অনুপম দৃষ্টান্ত। নির্মম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও তিনি প্রতিশোধ নেননি, বরং তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেছিলেন ।

তায়েফ গমনের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ

মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) তায়েফ গমন করেন। কিন্তু সেখানকার সাকিফ গোত্রের নেতারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা নবীজির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে শহরের বখাটে ও কিশোরদের লেলিয়ে দেয়।

নির্যাতনের ভয়াবহতা

তায়েফের লোকেরা তাঁকে নির্মমভাবে পাথর নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর পবিত্র শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং জুতো মোবারক পায়ের সাথে লেগে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি একটি ফলের বাগানে আশ্রয় নেন।

ফেরেশতাদের প্রস্তাব ও মহানবী (সা.)-এর ক্ষমার আদর্শ

অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো বদদোয়া করেননি। তখন পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা এসে তাঁকে তায়েফের দুইপাশের পাহাড় মিলিয়ে দিয়ে শহরবাসীকে পিষে ফেলার অনুমতি চান। কিন্তু দয়ার নবী (সা.) তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বরং তিনি আশা করেন আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে।

ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা

ক্ষমা প্রদর্শন তাকওয়াবানদের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। তায়েফবাসীর প্রতি মহানবীর (সা.) ক্ষমার এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা ইসলামের প্রকৃত আদর্শ ।

৬.আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর অভিজ্ঞতা:

আনাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর খেদমতে ১০ বছর ছিলেন। তিনি বলেন, "এই দীর্ঘ সময়ে নবী (সা.) আমাকে কখনোই কোনো কাজে অবহেলার জন্য তিরস্কার করেননি। আমি কোনো কাজ করলে তিনি বলতেন না যে, 'কেন করলে?', আবার কোনো কাজ না করলে বলতেন না যে, 'কেন করলে না?'" এটি নির্দেশ করে যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন ছোটখাটো ত্রুটিগুলোকেও অসীম ধৈর্যের সাথে ক্ষমা করতেন ।

৭.হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উদারতা:

কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী ক্ষমার এক অনন্য দলিল। তাঁর ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে কূপে ফেলে দিয়েছিল এবং বিক্রি করে দিয়েছিল। বহু বছর পর যখন ইউসুফ (আ.) মিশরের শাসনকর্তা হলেন এবং ভাইয়েরা তাঁর সামনে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হলো, তখন তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেছিলেন:

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন; তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ: ৯২)

৮.হজরত আবু বকর (রা.) এর ক্ষমা:

হজরত আবু বকর (সা.)-এর মেয়ে হজরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন মিস্তাহ ইবনে উসাসা। মিস্তাহ ছিলেন আবু বকর (রা.)-এর আত্মীয় এবং তাঁর আর্থিক সহায়তায় চলতেন। অপবাদে জড়িয়ে পড়ার পর আবু বকর (রা.) তাঁর ভরণপোষণ বন্ধ করে দেওয়ার কসম করেছিলেন। তখন আল্লাহতায়ালা কোরআনের আয়াত নাজিল করে তাদের ক্ষমা করে দিতে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পাওয়ার পর আবু বকর (রা.) নিজের কসম ভেঙে মিস্তাহকে আবার সাহায্য করা শুরু করেন।

৯.হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্ব ও ক্ষমা:

এক যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) যখন এক কাফেরকে পরাস্ত করে তার বুকের ওপর উঠে বসেছেন এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন, তখন সেই ব্যক্তি তাঁর মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করল। আলী (রা.) সাথে সাথে তার বুক থেকে নেমে গেলেন এবং তাকে ছেড়ে দিলেন। অবাক হয়ে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "কেন তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে?" আলী (রা.) উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমার গায়ে থুথু দিলে, তখন আমার রাগের কারণ ব্যক্তিগত হয়ে গেল। আমি নিজের রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করতে চাই না।”

১০.হযরত উমর (রা.) ও ইসলামের সৌন্দর্য:

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত উমর (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি নবী (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূল (সা.) তাকে পরম স্নেহে গ্রহণ করেন। অতীতে তিনি যা করেছিলেন, তার জন্য রাসূল (সা.) তাকে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করেননি। এই ক্ষমার কারণেই পরবর্তীতে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী হতে পেরেছিলেন

১১.হযরত হামজা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশি (রা.)-কে ক্ষমা:

উহুদ যুদ্ধে হযরত হামজা (রা.)-কে শহীদ করেছিল ওয়াহশি। মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহশি ভয়ে পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.)-এর কাছে আসে। ওয়াহশি ভয়ে ছিল যে, রাসূল (সা.) হয়তো তাকে দেখে রাগান্বিত হবেন বা তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেও তিনি প্রতিশোধ নেননি। বরং তাকে ইসলাম কবুল করার কারণে ক্ষমা করে দেন। যদিও তিনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি আমার সামনে আসবে না, কারণ তোমাকে দেখলে আমার প্রিয় চাচার কথা মনে পড়ে যায়।" এটি ছিল রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে এক অকল্পনীয় ক্ষমা।

১২.হাসান বিন আলী (রা.)-এর চারিত্রিক মাধুর্য:

হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.) একবার খাবার খাচ্ছিলেন। তখন তার একজন দাস ভুলবশত গরম ঝোল তার ওপর ফেলে দেয়। দাসটি ভয় পেয়ে গেল যে এখন হয়তো কঠোর শাস্তি পেতে হবে। সে সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করল: "যারা রাগকে সংবরণ করে।"

হাসান (রা.) সাথে সাথে বললেন, "আমি আমার রাগ সংবরণ করলাম।"দাস আবার বলল, "এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।"হাসান (রা.) বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"দাস এবার বলল, "এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"হাসান (রা.) বললেন, "যাও, আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম।”

১৩.কা’ব বিন জহির (রা.)-এর ক্ষমা:

কা’ব বিন জহির ছিলেন একজন কবি, যিনি ইসলাম ও মুসলিম নারীদের নিয়ে কটূক্তি করতেন। তিনি মৃত্যুর ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি মদিনায় এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং কবিতা পাঠ করে তাঁর প্রশংসা করলেন। মহানবী (সা.) তাঁর ওপর পূর্বের সমস্ত রাগের কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে শুধু ক্ষমাই করলেন না, বরং নিজের গায়ে থাকা চাদরটি তাঁকে উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন।

১৪.সালাউদ্দিন আইয়ুবীর জেরুজালেম বিজয় ও ক্ষমা :

১১৮৭ সালের জেরুজালেম বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য মহাকাব্য। এটি কেবল একটি সামরিক বিজয় ছিল না, বরং এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত ক্ষমার আদর্শের এক ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি।

১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা যখন জেরুজালেম দখল করেছিল, তখন তারা শহরে এক অবর্ণনীয় তাণ্ডব চালিয়েছিল। শহরের অলিগলি রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, হাজার হাজার মুসলিম ও ইহুদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, তখন রক্ত মানুষের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তাই ৮৮ বছর পর যখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শহরটি পুনর্দখল করলেন, তখন ইউরোপ ও ক্রুসেডারদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছিল—তারা নিশ্চিত ছিল যে সালাহউদ্দিন ঠিক একই রূপ দেখাবেন।

কিনতু তিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে করলেন ক্ষমা:

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ছিলেন একজন কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ছিল ইসলামের গভীর মমতা। তিনি শহরের ফটক দিয়ে প্রবেশের সময় কোনো লুটতরাজ বা প্রতিশোধের পথ বেছে নেননি।

তিনি ঘোষণা করেন, জেরুজালেমের প্রতিটি বাসিন্দা, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। প্রতিশোধের পরিবর্তে তিনি শান্তির পতাকা তুলে ধরেন।

দরিদ্রদের প্রতি উদারতা: মুক্তিপণের বিনিময়ে খ্রিস্টানদের শহর ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল, তাদের জন্য সালাহউদ্দিনের করুণা ছিল অসীম। তিনি কেবল নিজের অর্থ দিয়েই হাজার হাজার মানুষের মুক্তিপণ পরিশোধ করেননি, বরং তাঁর ভাই ও সৈন্যরাও নিজেদের সম্পদ খরচ করে বহু বন্দিকে মুক্তি দেন।

নারী ও শিশুদের সুরক্ষা: যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের রক্ষা করার জন্য তিনি কড়া নির্দেশ জারি করেছিলেন। ক্রুসেডারদের অনেক পরিবারকে তিনি নিরাপদে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীকে এসকর্ট হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

ধর্মীয় সহনশীলতা ও স্থাপনার মর্যাদা

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল মানুষের মন জয় করা। তিনি জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্থাপনাগুলো অক্ষত রেখেছিলেন। তিনি কোনো গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করেননি, বরং চার্চ অফ দ্য হোলি সেপালচারসহ প্রতিটি উপাসনালয়ের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো ধর্মের উপাসনালয় ধ্বংস করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

যুদ্ধের রীতিনীতি ও নৈতিকতা

ঐতিহাসিকরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, যুদ্ধের মাঠে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ছিলেন অজেয়, কিন্তু বিজয়ী হওয়ার পর তিনি ছিলেন নম্র। তাঁর এই ক্ষমার আদর্শ তৎকালীন বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি শত্রুপক্ষের ঐতিহাসিকরাও তাঁর মহত্ত্বের কথা লিখে গেছেন। যখন রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট (তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা) অসুস্থ ছিলেন, তখন সালাহউদ্দিন তাঁকে বরফ ও ফলমূল পাঠিয়ে সুস্থ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন—এটিই ছিল সেই যুগের বীরত্বের সর্বোচ্চ মানদণ্ড।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এই বিজয় আমাদের শেখায় যে, ক্ষমতাই শেষ কথা নয়, ক্ষমা ও উদারতাই মানুষকে অমর করে রাখে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে নয়, বরং ন্যায়বিচার ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে জয়ী হতে জানে। জেরুজালেম বিজয়ের পর তাঁর এই ক্ষমার ঘটনা আজও বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দলিল হয়ে আছে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করাকে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ মনে করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন: "ক্ষমা অবলম্বন করো, ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো।" (সূরা আরাফ: ১৯৯)।

যারা মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। কুরআনে বলা হয়েছে, যারা রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন।

অহংকার ধ্বংস করা: ক্ষমা মানুষের অহংকার দূর করে এবং হৃদয়ে শান্তি নিয়ে আসে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা: সমাজে প্রতিহিংসা নয়, বরং ক্ষমার সংস্কৃতিই প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে পারে।

অধ্যায় ৯: ইসলামের সার্বজনীনতা সৌন্দর্য :

ইসলাম একটি সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ভৌগোলিক সীমা, বর্ণ, ভাষা বা সংস্কৃতির কোনো গণ্ডিতে এটি সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল মানুষের জন্য এটি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ গাইডলাইন।

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট বংশ বা সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। এর বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্য। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল মানুষ আল্লাহর কাছে সমান।

ইসলাম কেবল আরব দের জন্য আসেনি ইসলাম সবার জন্য এসেছে । আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে কেবল নির্দিষ্ট কোন জাতি বা গোষ্ঠী জন্য প্রেরণ করেননি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে মানুষ এবং জীন উভয়ের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন ।

হজরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সমগ্র মানবজাতি ও জিনের নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতির জন্য নয়, বরং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

তিনি শুধু আরব বা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নবী নন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের নবী।

মানুষের পাশাপাশি জিন জাতির হেদায়েতের জন্যও তাঁকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

তিনিই আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী, এরপর আর কোনো নবী আসবেন না।

মানবজাতিকে পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবুয়তের ধারায় প্রথম নবী ছিলেন আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)।

আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে তাঁর শরিয়তকে পূর্ণতা দান করেন। ফলে নতুন কোনো নবী প্রেরণের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি বিশ্বনবী। আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনীত করেছেন।

আল্লামা ইবনে আবি ইয়ালা (রহ.) এ বিষয়ে মুসলমানের বিশ্বাস এভাবে তুলে ধরেন— ‘মুসলমান বিশ্বাস করে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী, সব নবীদের নেতা,

আল্লাহভীরু মানুষের সর্দার, আল্লাহর রাসুল, তাঁকে তিনি আমাদের প্রতি এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি আদমসন্তানদের ভেতর শ্রেষ্ঠতম। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকে উঠানো হবে এবং আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানরা মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত হবে। তিনি সব নবী ও তাঁদের উম্মতের জন্য সাক্ষী।
আল্লাহ সব নবী থেকে তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন ও তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদানের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানবজাতির নবী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ জানে না।' (সুরা সাবা, আয়াত : ২৮)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'বোলো হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসুল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী।
তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৮)
পবিত্র কোরআনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শেষ নবী ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সুরা আহজাব, আয়াত : ৪০)
কোনো ব্যক্তি যদি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিশ্বনবী হিসেবে বিশ্বাস না করে, তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তকে স্বীকার করে অথচ তিনি যে বিশ্বজগতের জন্য প্রেরিত তা অস্বীকার করে, তবে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। যদি না সে এই সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত।
আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, 'মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি তাদের জন্য মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদার দিকগুলো হচ্ছে তিনি শেষ নবী ও রাসুল, তাঁর মাধ্যমে দ্বিনে হানিফকে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং রাসুল তাঁর সুন্নাহতে সংবাদ দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। (তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬/৪৩০)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লেখেন, ‘এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানুষ ও জিনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং প্রতিটি মানুষ ও জিনের জন্য তাঁর ওপর ঈমান গ্রহণ করা এবং তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব।’ (মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৩০৩)

যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানবজাতি ও বিশ্বজগতের নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, তাই তাঁকে বিশ্বনবী বলা হয়। এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় সভ্য পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যায়, সব ধর্ম ও বর্ণের প্রতিনিধিরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দীকালেরও কম সময়ে পৃথিবীতে ইসলাম অন্যতম প্রধান ধর্ম ও নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়, যা অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাঁকে বিশ্বনবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘তিনিই তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন সুপথ ও সত্য দ্বিনসহ সব দ্বিনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।’ (সুরা সাফফ, আয়াত :৯) আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার, সাহাবিরা ও সব অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন

অধ্যায় ১০: ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য সৌন্দর্য:

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য কেবল জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং পারস্পরিক কল্যাণের সমন্বয়ে ব্যবসাকে একটি আর্দশ পেশা হিসেবে তুলে ধরাই হলো ইসলামের মূল সৌন্দর্য।
নিম্নে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য ও মূলনীতিগুলো তুলে ধরা হলো:
সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা: সততা ও আমানতদারিতা ব্যবসার প্রধান অলংকার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবেন" (তিরমিজি)।

হালাল উপার্জন ও নৈতিকতা: ইসলামে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া এবং হারাম পণ্যের ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হালাল উপায়ে ব্যবসা করলে তা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শামিল হয়।

পারস্পরিক সন্তুষ্টি: যেকোনো লেনদেনে বিক্রেতা ও ক্রেতার উভয়ের সম্মতি থাকা ইসলামের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, কিন্তু পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসার মাধ্যমে করো" (সূরা আন-নিসা: ২৯)।
নবীজির আদর্শ: স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনেক সাহাবি সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের সততা ও চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।
সামাজিক কল্যাণ: ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি ইসলাম যাকাত প্রদান, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করা এবং কর্মচারীদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়।

অধ্যায় ১১: অমুসলিমদের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর আচরণ যেমন ছিল:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের পাশাপাশি অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিস্তৃত নির্দেশনা প্রদান করে। কোরআন ও হাদিসে মুসলমানদের অমুসলিমদের সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ সব ধরনের সম্পর্কের বিষয়ে দিকনির্দেশনা আছে।

এর কারণ হলো, ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। এটি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে রাসুল) বলুন, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী।’ (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৫৮)

যে ধর্মের বার্তা সমগ্র মানবজাতি এবং তাদের সব শ্রেণির উদ্দেশে প্রেরিত, যে ধর্ম পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির প্রতিনিধি হয়ে এসেছে, তা কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতার শিক্ষা দিতে পারে না।

ইসলাম তার আকিদা ও বাণী প্রচারের জন্য কোনো ধরনের জবরদস্তি বা জোর-জুলুমের পথ অবলম্বনকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে।

ইসলাম সম্পর্ক স্থাপনে সত্যবাদিতা, নম্রতা, বিনয়, কোমলতা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা এবং ন্যায়-ইনসাফের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার ওপর জোর দিয়েছে। পাশাপাশি মিথ্যাচার, প্রতারণা, রূঢ় আচরণ, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা এবং অশান্তি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের এই নির্দেশনা শুধু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য নয়, বরং মুসলমান ও অমুসলিম উভয়ের সঙ্গেই এসব গুণ অনুসরণের নির্দেশ দেয়।

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের মূলনীতি

ইসলাম তার অনুসারীদের অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও উদারতার ওপর গুরুত্বারোপ করে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রত্যেক মানুষই তার মানবিক মর্যাদার কারণে সম্মানিত, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন এবং তার গায়ের রং বা জাতি যা-ই হোক না কেন। এই পৃথিবীটা হল মানবজাতির জন্য এক পরীক্ষার ক্ষেত্র। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে সঠিক পথ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার

স্বাধীনতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে কৃতজ্ঞ হবে বা অকৃতজ্ঞ।

’ (সুরা : আদ-দাহর, আয়াত : ৩)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আপনার রব চাইলে সব মানুষকে একই পথের অনুসারী বানিয়ে দিতেন কিন্তু (কাউকে জোর করে কোনো দ্বিন মানতে বাধ্য করাটা তাঁর হিকমতের পরিপন্থী। তাই তাদেরকে তাদের ইচ্ছাক্রমে যেকোনো পথ অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম সব মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেয়। এটি এমন একটি ধর্ম, যা তার অনুসারীদের, তা সে মুসলিম বা অমুসলিমের সঙ্গেই হোক, কখনোই অন্যায় বা অবিচার করতে নিষেধ করে। ইসলামে জুলুম ও অধিকার হরণের কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মজলুম-নিপীড়িত ব্যক্তির দোয়া—সে যদি কাফিরও হয়, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১১, হাদিস : ২৩৫৩৬)

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকারভেদ

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকারভেদ নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা সম্পর্কের তিনটি শ্রেণি বর্ণনা করেছেন—

১. মুওয়ালাত : মুওয়ালাত বলতে অন্তরের গভীর ভালোবাসা ও হৃদয়ের সখ্যকে বোঝানো হয়। এটি শুধু মুসলমানদের মধ্যে বৈধ এবং সহধর্মীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ। কাফির ও মুশরিকদের সঙ্গে গোপনীয় সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখা বা এমন কোনো সম্মান প্রদর্শন করা, যা কুফর ও শিরকের প্রতি শ্রদ্ধার সমতুল্য হয়, এটি ইসলামী দৃষ্টিকোণে বৈধ নয়। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৯৫)

কোরআনের বহু আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে কুফর ও শিরক গ্রহণকারীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বা আপস করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এগুলো মূলত মুওয়ালাত সম্পর্কিত নির্দেশ। (তাফসিরে রাজি, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৪)

২. মুওয়াসাত : মুওয়াসাত অর্থ সহানুভূতি, কল্যাণকামিতা এবং উপকার সাধন। এমন অমুসলিম যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে না বা শত্রুতায় লিপ্ত নয়, তারা সহানুভূতি

ও কল্যাণকামিতার যোগ্য। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা বৈধ। এর ফলে অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং মুসলমানদের সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ দেখে মুগ্ধ হবে। এতে পারস্পরিক দূরত্ব কমবে এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। (বয়ানুল কুরআন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৪)

৩. মুদারাত : মুদারাত বলতে সদাচরণ ও নম্র ব্যবহারকে বোঝানো হয়। এটি সব ধরনের অমুসলিমের সঙ্গে বৈধ। বিশেষত, যখন এর উদ্দেশ্য হয় ধর্মীয় কল্যাণ সাধন, ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো বা ইসলামের নৈতিকতার পরিচয় দেওয়া। এ ছাড়া যদি তারা অতিথি হয়, তবে অতিথির সম্মান জানানো প্রত্যেকের কর্তব্য। আবার কখনো কখনো এর উদ্দেশ্য তাদের ক্ষতি বা দুশ্চরিত্র থেকে নিরাপদ থাকা হতে পারে। (আল-জামে লি আহকামিল কোরআন, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৩৫)

কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকে প্রমাণিত হয় যে একজন মানুষ, সে অমুসলিম হলেও তার কিছু মৌলিক মানবিক অধিকার রয়েছে। যেমন—জীবনযাপনের অধিকার, অর্থনৈতিক সংগ্রামের অধিকার, সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা এবং তা ব্যবহার করার অধিকার ইত্যাদি। ইসলাম তাদের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা সুরক্ষার শিক্ষা দেয় এবং মানবতার প্রতি এই মৌলিক অধিকারগুলোকে সম্মান করার নির্দেশনা দেয়।

নবীজীবনের আলোকে অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক

ইসলাম শুধু অমুসলিমদের সঙ্গে সহনশীলতা, উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশই দেয় না, বরং ইসলাম এই গুণাবলিকে শুধু পছন্দনীয় নয়, বরং সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র জীবনবৃত্তান্তে, বিশেষত তায়েফ সফর, বিভিন্ন যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের ঘটনাবলিতে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়, যা উজ্জ্বল উদাহরণে পরিপূর্ণ, যার তুলনা ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর এগুলো এমন পরিস্থিতিতে ঘটেছিল, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন এবং তাদের পক্ষ থেকে সর্বদা ক্ষতির আশঙ্কা ছিল।

সাধারণত এমন সংকটময় অবস্থায় মানুষ উত্তম আচরণ বা সহমর্মিতার পথ থেকে সরে যায়, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) সেই সময়েও মানবতার প্রতি সম্মান বজায় রেখেছিলেন।

এটাই ইসলামী শিক্ষার মূল সৌন্দর্য, যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উত্তম চরিত্র ও সহনশীলতার ওপর জোর দেয় এবং কখনো অমুসলিমের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করে না।

তাই একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের এই শিক্ষাগুলোকে তার জীবনযাপনের অংশ করা এবং অমুসলিমদের প্রতি সদয় আচরণ করা। এভাবেই ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো দূর করা সম্ভব এবং ইসলামোফোবিয়ার মতো অপপ্রচারের মোকাবেলা করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার ও মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

অধ্যায় ১২: মহানবী (সা.) বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ও ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য:

মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহতায়লার হুকুমে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং ধ্বংস হবে। যিনি সর্বত্র বিরাজমান। যিনি সবকিছু দেখতে ও শুনতে পান। যিনি কিয়ামতের দিন আমাদের ভালো-মন্দের বিচার করবেন।

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য। মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন খলিফা হিসেবে। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমাদ (সা.)–কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে: 'তিনি মহান আল্লাহ, যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত (পথনির্দেশ) ও সত্য দ্বীন (জীবনবিধান) সহকারে; যাতে প্রকাশ্য বিজয়ীরূপে স্থাপন করতে পারেন দ্বীন ইসলামকে সব দ্বীনের (বিধান ও মতবাদ) ওপর; আর সাক্ষী ও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সুরা-৪৮ আল ফাৎহ, আয়াত: ২৮)।

ইসলামের মঙ্গল বিষয় যেমন -আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসুল, শেষ দিবস, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করাই হলো প্রকৃত ঈমান। যার ঈমান আছে তাকে মুমিন বলে। আর ঈমানের ফল হলো মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন বিশ্ব তথা মানব জাতির জন্য রহমত হিসেবে। হজরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে প্রথম নবীর আগমন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীতে নবী-রসুলের আগমন পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবেন না। তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মনোনীত নবী। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা তার উম্মতের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নবী-রাসুলগণ থেকে আমরা তাওহীদ, রিসালাত, দীন, আখলাক, শরীআত ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করে, ইহকালে মঙ্গল ও

পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারব। আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে সকল সম্প্রদায়ের নিকট নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার এ মহান জিম্মাদারি তার উম্মতের মাঝে যারা কোরআন হাদিসের জ্ঞানে জ্ঞানী তাদের ওপর দিয়েছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন, তার পরে যদি কেউ নবী হতো সে হতো ওমর (রা.)। কিন্তু পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে যে হাজার হাজার নবী রসুল এসেছেন তাদের বিশেষ সম্প্রদায়ের নবী রসুল হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আখেরি নবীর আগমন ঘটেছে সমগ্র মানব জাতির জন্য। ইরশাদ করা হয়েছে— ‘হে নবী আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।’ (২১-সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় এসেছিলেন মিথ্যা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে। যারা সত্যের পথের অনুসারী তাদের আখিরাতের জীবনে কীভাবে পুরস্কৃত করা হবে তার বার্তাবাহক হিসেবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে, ‘আমি আপনাকে সমগ্র জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’ (৩৪-সূরা সাবা : ২৮)

অন্যত্র, মানব জাতিকে লক্ষ্য করে মহান স্রষ্টা ইরশাদ করেছেন, ‘মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।’ (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৪০)।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কথা পবিত্র কোরআনের পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোতেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে, ‘হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রসুল, সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার আগে এসেছে, আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রসুলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমদ।’ (৬১-সূরা আস-সফ : ৬)

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মহাগ্রন্থ আল কোরআন কারিমে বিভিন্ন সুরা ও আয়াত নাজিল করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: ‘নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে।’ (সুরা-২ আল বাকারা, আয়াত: ১২৯)।

বিশ্বনবী (সা.)–কে আল্লাহ তাআলা শুধু দু-একটি ছোটখাটো মামুলি উদ্দেশ্য নিয়ে দুনিয়ায় পাঠাননি; বরং বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ কল্যাণের মহতী উদ্দেশ্যেই মহানবী (সা.)–কে এই জগতে পাঠানো হয়েছে। কোরআন মজিদে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন: 'হে নবী (সা.)! আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সুরা-২১ আল আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষ কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হননি; তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের জন্যও প্রেরিত হননি; তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। রব্বুল আলামিন বলেন: 'আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবতার জন্য সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সুরা-৩৪ আস সাবা, আয়াত: ২৮)।

পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-এর সব ধরনের পবিত্রতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। যেমন—

মহানবী (সা.)-এর চিন্তা, ভাবনা ও মেধাশক্তি ছিল পঙ্কিলতামুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। ' (সুরা : নাজম, আয়াত : ২)

পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে মহানবী (সা.)-এর শ্রবণশক্তির পবিত্রতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এটা তো ওহি যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। ' (সুরা : নাজম, আয়াত : ৩-৪)

মহানবী (সা.) পবিত্র দ্বীন ইসলামের ধারক ও বাহক ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি সেই পবিত্র সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বিনসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে তা সব দ্বিনের ওপর বিজয়ী হয়। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। ' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৩৩)

আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা ও খ্যাতি দান করেছেন। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। ' (সুরা : আশ-শরাহ, আয়াত : ৪)

নবীজি (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ কোরআন একটি আলোকদীপ্ত ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এ কোরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার। ' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৯)

আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদিকে ‘উত্তম জাতি’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কোরো এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করো। ’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করবে সে আল্লাহতায়ালার আনুগত্য করল, আর যদি কেউ নবী করিম (সা.) কে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো বিষয় বাস্তবায়ন করে তবে তা আল্লাহর দায় থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ সূরা আন নিসার ৮০ নং আয়াতে বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যাই হোক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।’

মানব জীবনের সকল স্তরে যদি আল্লাহ নিদের্শিত এবং রাসূল (সা.) প্রদর্শিত নির্দেশাবলীর প্রতিফলন না ঘটে তবে তা হবে আনুগত্যহীন কাজ এবং তা এক পর্যায়ে মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোরআনে কারিমের নির্দেশনা হলো- ‘হে নবী! তাদেরকে বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চই আল্লাহ এমন লোকদের মহব্বত করবেন না যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।’ -সূরা আল ইমরান: ৩২

হজরত রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে জান্নাত ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিদ্যমান। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।’ -সূরা আন নূর: ৫৬

নবী করিম (সা.)-এর আনুগত্য ও তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জান্নাতি মানুষ হবার জন্য কখনই আল্লাহ এবং রাসূলের সামান্যতম বিরোধিতা করা যাবে না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। ধর্মকে মানব জাতির কল্যাণে প্রয়োগ করতে শিখিয়েছেন। নারীর অধিকার, শ্রমের মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় সংবিধান, যুদ্ধ কৌশল, সব কিছুই শিখিয়েছেন মহানবী (সা.)। মহানবীর আদর্শ ও ইসলামের সুশীতল ছায়া মানব জাতির আশ্রয়স্থল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ মেনে চললে ইহকাল ও পরকালে রয়েছে শান্তি এবং মুক্তি।

অশান্ত পৃথিবীতে স্বর্গীয় শান্তির সুবাতাস আনয়নের স্বার্থে মহানবী (সা.)-এর জীবনদর্শন অনুশীলন করা এবং তাঁর আচার-আচরণ অনুসরণ করা একান্ত অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন তাঁর জীবনচরিত তথা কর্মময় জীবনের ব্যাপক অধ্যয়ন ও বিপুলভাবে চর্চা করা।

অধ্যায় ১৩: ইসালমে খেলাফতের সৌন্দর্য:

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের বিধান সকল যুগে সকল মানুষের জন্য চিরস্থায়ীভাবে চিরকল্যাণকর। মূলতঃ ইসলামের তাওহীদী মূল দর্শনের উপরেই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মূল ভিত। মৌলিকভাবে ইসলামী খেলাফত বিশ্বমানবতাকে এক শান্তিময় সমাজ উপহার দিয়েছে। যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখ্য যে, মানুষের সমাজ জীবনসহ তাদের সার্বিক জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত এবং শান্তিময় করার জন্য যতগুলো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ সংস্থা। আর নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব হ'ল একটি রাষ্ট্রের মূল উপাদান।

খেলাফতের পরিচয় :

'খেলাফত' শব্দটি আরবী, যার অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। পারিভাষিক অর্থে 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আইনগত কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিগঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে ইসলামী খেলাফত বলা হয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'খেলাফত বলতে এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বুঝায় যা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত'। মোটকথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করার প্রতিনিধিত্বই হল খেলাফত।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সমস্ত বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যেন মুহূর্তের ব্যাপার। তাই নিজ দেশের পরিস্থিতিকে আর বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মিয়ানমারের গণতন্ত্রের মানসকন্যা খ্যাত ও শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সূচি তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিজয়ের জয়মাল্য পরিধান করেছেন। বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত আরাকানের অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিম মানবতা। কিন্তু বিশ্বকে হতাশ ও বিমূঢ় করে ১৯৪২, ১৯৭৮ ও ১৯৯২-এর ন্যায় ২০১২ সালের ৮ই জুন সূচি'র দেশের নরপশু সদৃশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিরীহ মযলুম রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালায়। ছুটে আসে তারা আশ্রয় নেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী আমাদের মুসলিম নামধারী সরকার চূড়ান্ত অমানবিকতা প্রদর্শন করে তাদের এতটুকু আশ্রয় প্রদান করতে সম্মত হয়নি। বিশ্ববাসী এই

অমানবিক নিপীড়নের মর্মান্তিক দৃশ্য অসহায়ের মত অশ্রুসজল নেত্রে অবলোকন করেছে। তাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে, মানুষের তৈরী করা বিভিন্ন মতবাদ ও তন্ত্রমন্ত্রের হোতাদের নগ্ন চেহারা কত বীভৎস। তাই সারাবিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে মুক্তির প্রকৃত সত্য পথের দিকে।

উন্নত রাষ্ট্র আর উন্নয়নশীল বিকাশমান রাষ্ট্রের (মুসলিম বা অমুসলিম) দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, বিশ্ব সভ্যতার সূচনাকারী এবং বিশ্ব মানবতার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী ও অধিকর্তা মুসলিম জাতির অবস্থা আজ অত্যন্ত করুণ। জাতিসংঘ ও ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন ও উজাড় করে চলেছে একের পর এক মুসলিম জনপদ ও দেশসমূহকে। পারমাণবিক বোমা নামক মারণাস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত অসহায় মানবতা অত্যাচার-নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট ও নিগৃহীত হচ্ছে অবিরত। আলেমদের ঘুম খুন হয়রানি করছে এই কুফুরি জালেম শাসক রা বোন আফিয়া সিদ্দিকী থেকে উসমান হাদি রাফিসা আসিয়া মারিয়া আমাদের বোনেরা প্রতিনিয়ত রাপ হত্যার শিকার হচ্ছে।

এই কুফুরি মতবাদের কারণে কোন মানুষ আজ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পায়নি অন্যদিকে চরম অনৈতিকতার বিস্তার ঘটছে তাদের চালু করা আকাশ সংস্কৃতির বিভিন্ন রকমারী আয়োজনের হিংস্র থাবায়। পাশাপাশি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে অনুসরণ করছে মস্তিষ্কপ্রসূত নানা মতবাদের। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বস্তুবাদী মতাদর্শের।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষের মতাদর্শ। এছাড়া দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় মানবরচিত আইনে মুমিনকে জেল-ফাঁসি বরণ করতে হচ্ছে। ফলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। এভাবেই সমস্ত দুনিয়া আজ মিথ্যা, অন্যায়, অকল্যাণের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ইসলামী খেলাফতের বাস্তবতা :

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ, যা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি মানবজাতির জন্য সর্বাবস্থায় চির কল্যাণকর। যার মধ্যে সকল যুগের সমস্ত মানুষের জন্য জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট ও স্থায়ী কল্যাণের পথনির্দেশ রয়েছে। যা সকলের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয় ও পালনীয়।

আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত আইনবিদ এ. কে. ব্রোহী, বিশ্বনন্দিত বিচারপতি জাস্টিস কায়ানী, জাস্টিস কর্নোলিয়াস, জাস্টিস মুরশেদ, জ্ঞানতাপস ড. মুঃ শহীদুল্লাহ সকলেই মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বশান্তি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে একটি ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি'। কতগুলো ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়াত ও সমাধান পেশ করেছে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল প্রয়োজনীয়তা এ কারণে যে, পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে যেন ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয় এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইসলামী খেলাফতের কোন বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন মুসলমান ব্যক্তির জীবনে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে পালনের স্বাধীনতা থাকলেও বৈষয়িক জীবনে বস্তুবাদী আইনে শাসিত হতে হয়। ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণের ফলে একজন মুমিন ব্যক্তির রিযিক হারাম রিযিকে পরিণত হয়। অন্যদিকে মস্তিষ্কপ্রসূত আইনসমূহের চোরাবালিতে অসহায় ও নির্দোষ ব্যক্তিরা বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানে। অবশেষে চূড়ান্ত ফায়সালায় ফাঁসি, না হ'লে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে নির্জন-নিভৃতে নীত হয়। ফলে তথাকথিত আইন মানুষের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে অরুচিকর বিষয়ে পরিণত হয়। যার কারণে সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সুবিচারের পথ বিলুপ্ত হয়। ব্যাপকতা লাভ করে বিশৃঙ্খলা আর অস্থিতিশীলতা। আর এ সমস্ত কারণেই একজন মুসলিম সর্বদা দেশে-বিদেশে সর্বত্র ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকবে। কারণ ইসলামী খেলাফত শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং খেলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় :

ইসলামী খেলাফত কেবলমাত্র ইসলামী তরীকার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শেরেকী তরীকার মাধ্যমে নয়। সুতরাং ইসলামী খেলাফত

প্রতিষ্ঠার উপায় হ'ল দু'টি : **দাওয়াত ও জিহাদ**। কেননা পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী ও রাসূল তাদের সুদীর্ঘ জীবনে শুধুমাত্র দাওয়াতী জীবন পরিচালনা করে গেছেন। পরিধিগত তারতম্যের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দাওয়াতী মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে উদ্দিষ্ট বিষয়ের জোরালো প্রচার-প্রচারণা চালানের কোন বিকল্প নেই। নীতি, আদর্শ আর কর্মসূচী অক্ষুণ্ণ রেখে জনমত সৃষ্টি করতে হয়। যাতে করে মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যা সকল আম্বিয়ায়ে কেরামগণ করে গেছেন। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তার আদর্শ প্রচার করে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদরূপী একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী তৈরী করেছিলেন। তাদের ত্যাগপুত মানসিকতায় ইসলাম একদিন মক্কা-মদীনার গন্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের কাংখিত খেলাফত। আজকের দিনেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আবারও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং প্রথমোক্তটির মাধ্যমে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চিন্তাধারায় বিপ্লব আনতে হবে। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এবং সেই সাথে যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশ ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। যেন ইসলামী খেলাফতের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে মানব জাতির সকল স্তরে স্পষ্ট ধারণা ও মঙ্গল চেতনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টির জন্য ব্যাপক বস্তুগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এজন্য ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে সীসাঢালা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এটাই হবে জিহাদের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। সমাজের প্রতিটি স্তরে, গ্রামে ও মহল্লায় যখন একদল সচেতন আল্লাহভীরু ও যোগ্য মুজাহিদ তৈরী হয়ে যাবেন এবং স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন। তখন সংখ্যায় যত নগণ্যই হৌক না কেন, আল্লাহর সাহায্যে তারাই জয়লাভ করবেন। এভাবে সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনকি তিনজন মুমিন একস্থানে থাকলেও তাদেরকে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *(মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬৪৭; আবুদাঊদ হা/২২৭২)* এই ইমারতের মাধ্যমে সুশৃংখলভাবে দেশব্যাপী দাওয়াত ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ধরনের সাংগঠনিক ও জিহাদী ইমারতের পথ বেয়েই

একদিন জাতীয় ভিত্তিক ‘খেলাফত’ প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। যদিও পূর্ণাঙ্গ ‘ইসলামী খেলাফত’ কেবলমাত্র ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের পরেই সম্ভব হবে । সুতরাং শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি এবং শরীয়তভিত্তিক বিশুদ্ধ আইন-কানুনসহ যাবতীয় দিক ও বিভাগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্বক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী খেলাফত ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই সর্বোত্তম ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে সর্বত্র ন্যায় ও ইনছাফভিত্তিক সুবিচারের মাধ্যমে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, নারী-পুরুষসহ প্রত্যেক নাগরিকের পূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করণের বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে রয়েছে। একটা সুন্দর কথা না বললে নয় আমাদের উস্তাদ বলত খেলাফত যে কত সুন্দর ব্যবস্থা তা যদি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টানরা ও জানত তাহলে তারা খেলাফতের জন্য আন্দোলন শুরু করত।

অধ্যায় ১৪: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদায় তার সৌন্দর্য:

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)*। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তিনি আরো বলেন,

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' *(নিসা ১)*।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি

কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? *(তাকভীর ৮-৯)*।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য

করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' *(নূর ৩৩)*। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভাল'।[ব তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া

(আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' *(হুজুরাত ১৩)*।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

১.বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা

তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' *(নিসা ৩)*।

২.স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ

'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।

৩.স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' *(নিসা ১৯)*।

৪. মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।

৫.সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

'হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

হাদীছে এসেছে,

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ'তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ'লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

পরিশেষে বলব যে, তথাকথিত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ইসলামের স্বকীয়তা ও প্রাণসঞ্জিবনী শক্তির ক্রমবর্ধমান ধারাকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করছে। যদিও তা

রকমারী বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন উপাদানে ভরপুর। প্রচলিত পাশ্চত্য পন্ডিতদের রচিত অসংখ্য রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদসমূহ ইসলামকে অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রেখেছে। ইসলামের আদর্শবাদী চিন্তা ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড ইহুদী-খ্রীস্টান সাম্রাজ্যবাদী চক্র নানা অজুহাতে অবদমিত করছে। অন্যদিকে ইসলামের নামে সামাজিক কুসংস্কার, উছূলী বিতর্ক, দলীয় বিভক্তি অখন্ড মুসলিম উম্মাহকে আরো বহুগুণে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ফলে আজ ইসলামের পুনর্জীবনী শক্তির সমুন্নত ধারা চরমভাবে হুমকির সম্মুখিন। তারা ইসলামকে নিছক একটি আচার- অনুষ্ঠান, ভাবাবেগ ও কিছু বিশ্বাসের সমষ্টির নাম বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ইসলাম একটি জীবন্ত জীবন বিধান, জীবনের সকল অস্তিত্ব ও সমস্ত কর্মপরিসর ঘিরে এর আবর্তন। সমগ্র মানবতার আর্থ-সামাজিক নীতিমালার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাপাত ও একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এমতাবস্থায় বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির অভয়বাণী শুনাতে, স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণে, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সমস্ত নব্য জাহেলিয়াতের খড়গকে মুসলিম সমাজ থেকে উৎখাত করে সমাজের সর্বস্তরে খাঁটি তাওহীদবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচনের। আর এর জন্য বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে। তাহ'লেই মুসলিম জাতি তাদের হারানো গৌরবান্বিত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শক্তিমত্তা পুনরায় ফিরে পাবে। অর্জন করবে বিশ্ব পরিচালনার নেতৃত্ব। মানুষের আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইনই হবে মানবজীবন পরিচালনার মূল ভিত্তি। যা ইসলামী খেলাফতের মৌলিক বক্তব্য। শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা হবে জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। যার ওয়াদা আল্লাহ মুমিন বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হন। আমীন!

অধ্যায় ১৫ :ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়ের অধিকার তার সৌন্দর্য:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। যা মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসার সুনিপুণ সৌধ নির্মাণ করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মানুষ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ব্যবহার কামনা করে এবং ইসলামের দাবিও এটি। বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্কের মজবুত করা শুধু ইসলামি শরিয়তের বর্ণ বিন্যাসে নয়; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরও চাহিদা। কেননা, বাংলায় আত্মা থেকে আত্মীয়তা শব্দের উৎপত্তি। তাই আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া রক্তের ধারা থেকে আত্মীয়তার জন্ম।

একটি সুন্দর সমাজ বা পরিবার গঠনে আত্মীয়তার সম্পর্ক অতুলনীয়। আত্মীয়তার সুসম্পর্কের অটুট বন্ধন একজন ব্যক্তিকে সুখ-দুঃখ, অনুকূল-প্রতিকূল নানা ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে আত্মীয়তা বন্ধনের স্বর্ণ-সুতা পুড়িয়ে ছাই করে যদি পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করানো যায়, তাহলে তার জীবনটা হয়ে ওঠে অনেকটা বিপন্ন এবং ব্যর্থ।

সমাজে একজন ব্যক্তির সম্পর্ক দুইভাবে স্থাপিত হয়। এক আত্মীয়তা, দুই অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক। কিন্তু এরমধ্যে আত্মীয়ের সম্পর্কই সবচেয়ে মজবুত ও নিকটের। আত্মীয়ের আত্মিক অনুভূতির সন্ধান মেলে সুখে-দুঃখে ও বিভিন্ন অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। বিপদের মুহূর্তে আত্মীয় যেভাবে সাড়া দেয়, অন্য কারো পক্ষে সেরকম সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সমাজে বেঁচে থাকার জন্য আত্মীয়ের সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। এক আত্মীয়ের অন্তরে অন্য আত্মীয়ের দুঃখের জ্বালা এবং সুখের জোয়ার থাকবেই। মানুষ সামষ্টিক জীব। নিকট স্বজন ছাড়া মানুষের পক্ষে সামাজিক জীবন পরিচালনা করা কঠিন ব্যাপার।

সম্পর্ক দুই ধরনের হয়ে থাকে, কাছের এবং দুরের। নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি দূরাত্মীয়ের অনুভূতির চেয়ে

অপেক্ষাকৃত মজবুত। মূলত আত্মীয়তার পাঁচটি উৎস রয়েছে। এক. মায়ের দিকের আত্মীয়; যেমন- নানা-নানি, মামা ইত্যাদি। দুই. বাবার দিকের আত্মীয়; যেমন- চাচা-চাচি,

দাদা-দাদি, ভাইবোন। তিন. বিয়ের সম্পর্কের আত্মীয়; যেমন- শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা, দেবর ইত্যাদি। চার. নিজের সম্পর্কের আত্মীয়; যেমন- ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি,

ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগনি। পাঁচ. দুধ সম্পর্কের আত্মীয়; যেমন- দুধ মা, দুধ বাবা, দুধ ভাইবোন। এভাবে আত্মীয়তার ধারা বাড়তে থাকবে।

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামের অনুসারী কোনো মোমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাক্সক্ষা পোষণ করলে তাকে অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। এককথায় আত্মীয়দের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা পোষণ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা, সাহায্য এবং উপদেশ দিয়ে তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হবে। হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহানবী ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার রিজিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা’- (মিশকাত ৪১৯)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বলেন, ‘প্রিয় নবীজী মদিনায় আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমিও তার দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তার যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই- ‘হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশি করে সালাম দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে খাদ্য দান করো। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলো এবং এমন সময়ে নামাজে মনোনিবেশ করো, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’- (মিশকাত)।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহতায়ালা সবার সঙ্গে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য’- (সুরা নাহল আয়াত ৯০)। আলোচ্য আয়াতাংশে সদ্ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের আর্থিক সেবা-যতœ করা, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হজরত সালমান ইবনে আমের (রাযি.) বলেন,

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন ‘সদকার মাল সাধারণ গরিব-মিসকিনকে দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সাওয়াবই পাওয়া যায়।

অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দুটি সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হলো আত্মীয়তার হক আদায় করার সাওয়াব।' উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে বাবা-মায়ের হক্কের ব্যাপারে তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, '(বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহতায়ালা যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে।

ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত'- (সূরা বাকারাহ আয়াত ২৭)।

উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, যেসব সম্পর্ক শরিয়ত বহাল রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর এবং অন্যান্য মানুষ তথা সৃষ্টিকুলের, অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎ সংশ্লিষ্ট সীমার নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। অন্য এক হাদিসে আল্লাহর নবী ইরশাদ করেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেস্তে প্রবেশ করবে না'।

হাদিসে বর্ণিত ঐতিহাসিক একটি ঘটনা হচ্ছে, ষষ্ঠ হিজরি সনে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বনী মুস্তালিম নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমনকালে

বিবিদের মধ্যে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার সময় ঘটনা ক্রমে মা আয়েশা

সিদ্দিকা (রা.) পেছনে পড়ে যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল কাফেলার পশ্চাতে ফিরার পথে হযরত আয়েশা (রা.) কে দেখে বিস্মিত হলেন এবং সঙ্গে নিয়ে এলেন। এদিকে মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মা আয়েশার পবিত্র চরিত্রের প্রতি অনর্থক অপবাদ আরোপ করল এবং হাস্সান, মিমতা, হামনাহ কয়েকজন সরলমনা মুসলমানকে শামিল করাল তার স্বপক্ষে।

অবশ্য তাদের প্রতি 'হদ' বা শাস্তি জারি হয়েছিল এবং মা আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে আয়াত নাজিল হয়েছে। এখানে আসল কথা যেটা আমার বর্ণনার উদ্দেশ্য

ছিল মিসতাহ হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর আত্মীয় এবং গরিব। যার কারণে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করতেন।

যখন তার মেয়ের প্রতি অপবাদকারীদের মধ্যে সে শামিল হয়ে পড়ল, তখন তিনি তার প্রতি আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করে তা অব্যাহত রাখার বিশেষ তাকিদ প্রদান করেছেন। এ দ্বারাও বুঝা যায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে আত্মীয়তার অধিকার বুঝে তদানুযায়ী আমল করার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং একইসঙ্গে তা পালনের শক্তি ও সামর্থ্যরে জোগান দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের যেন তা পালন করার শতভাগ তওফিক দান করেন। আমিন।

অধ্যায় ১৬:মা বাবার সম্মান ও অধিকার তার সৌন্দর্য:

ইসলাম মাতা-পিতাকে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। ইসলামের বিধানমতে, আল্লাহ তাআলার পরেই মাতা-পিতার স্থান। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের উফ্ (বিরক্তিও অবজ্ঞামূলক কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে।

মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বলো, “হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।”’ (সুরা ইসরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪)। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন, ‘আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।’ (সুরা লুকমান, আয়াত: ১৪)।

আর আমি (আল্লাহ) মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে; তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন ও অতিকষ্টে প্রসব করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।’ (সুরা আহকাফ, আয়াত: ১৫)। আরও বলা হয়েছে, ‘আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।’ (সুরা নিসা, আয়াত: ৩৬)।
উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পরেই মা-বাবার অধিকার। সেই অধিকার কীভাবে আদায় করতে হবে, সেটাও বলা হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদিসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?’ তিনি বললেন ‘তোমার মা’; সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’; সে আবারও বলল, ‘তারপর

কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। সে পুনরায় বলল, ‘এরপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার পিতা’। (বুখারি ও মুসলিম)। প্রিয় নবী (সা.) আরও এরশাদ করেন, ‘জান্নাত মায়ের পদতলে’। (মুসলিম)মাতা-পিতার খেদমত না করার কারণে যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো, রাসুল (সা.) তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন।

হাদিস শরিফে এসেছে—একদা জুমার দিনে রাসুল (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! তার পর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! এরপর খুতবা দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আজ যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখিনি (আপনি একেক ধাপে পা রেখে আমিন, আমিন, আমিন, বললেন); এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?’নবী করিম (সা.) বললেন: না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়; বরং আমি মিম্বরে ওঠার সময় হজরত জিবরাইল (আ.) এলেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।’ তখন আমি রাসুল (সা.) সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক)। আমি যখন মিম্বরের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।’ তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! আমি যখন মিম্বরের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনল, কিন্তু দরুদ (নবীজির প্রতি শুভকামনা) শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক।’ তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও জাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।’ হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, ‘আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি

যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।' (সুরা মারিয়াম, আয়াত: ৩০-৩২)।

বনি ইসরাইলের নবী হজরত মুসা (আ.)-এর প্রতিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আর আমি বনি ইসরাইল থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ৮৩)।পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদের অধিকারী ও উত্তরাধিকারী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: 'আর পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ যদি তার সন্তান থাকে; আর যদি সন্তান না থাকে, তবে পিতা-মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবেন, এমতাবস্থায় তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১১)। রাসুল (সা.)-এর বিখ্যাত এক আশেকে রাসুলের ঘটনা আমরা জানি। যিনি প্রিয় নবীজি (সা.)-কে দেখেননি। সেই আশেকে রাসুলের নাম হজরত ওয়াইস আল করনি (রা.)। প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জমানায় থেকেও তিনি সাহাবি হতে পারেননি মায়ের সেবা করার কারণে। তবে এতে করে তাঁর মর্যাদা কমেনি; বরং তিনি সম্মানিত হয়েছেন। একবার ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীজির কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ। এখন আমি কী করতে পারি?' নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, 'আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি ও বেশি ফজিলতের কাজ।' শুধু তা-ই নয়, নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি জুব্বা তার জন্য রেখে যান এবং বলেন, 'মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি; আমার ইন্তেকালের পর আমার এ জুব্বাটি তাকে উপহার দেবে।' নবীজি (সা.) জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে এবং তিনি বলেন, 'হে ওমর! ওয়াইস আল করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।'

অধ্যায় ১৭ :ভাই-বোনের সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামের অনুপ্রেরণার সৌন্দর্য:

পৃথিবীতে মা-বাবার পর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভাই-বোনের। একসঙ্গে থাকা, স্কুল-মক্তবে আসা-যাওয়া, গল্প-আড্ডা, বেড়াতে যাওয়া ও মান অভিমানসহ পরিবারের সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী থাকে এই ভাই-বোনেরা।

মা-বাবার আদর-শাসনে বেড়ে ওঠা অম্লমধুর এই সম্পর্ক একসময় ফিকে হয়ে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও পরিবার গড়ে ওঠে। ফলে ছোটখাটো ঘটনার জের ধরে অনেক সময় ভাই-বোনের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়। শৈশবের সুখস্মৃতি অস্বস্তি ও তিক্ততায় রূপান্তরিত হয় পরিণত বয়সে।

কিন্তু ইসলাম এই দূরত্ব ও তিক্ততা সমর্থন করে না; বরং শৈশব থেকে আমৃত্যু একে অপরের প্রতি যত্নবান ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্বারোপ করে। এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।

(মুসলিম, হাদিস : ৬৪১৩)

আর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ভাই-বোনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। তাই যে ব্যক্তি বোনদের প্রতি যত্নশীল হবে তাদের ফজিলতের কথা তুলে ধরে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৬)

তা ছাড়া স্বভাবত বোনেরা ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক ও দুর্বল হয়ে থাকে। তাদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার টান একটু ব্যতিক্রমী হয়। ইতিহাসে ভাইয়ের প্রতি বোনের আন্তরিক ভালোবাসার অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক নারীর স্বামী, সন্তান ও তার ভাইকে যুদ্ধবন্দি করে তার কাছে নিয়ে আসে। এরপর ওই নারীকে বলল, তুমি এই তিনজনের মধ্যে কোনো একজনকে মুক্ত করে নিতে পারো। তখন

ওই নারী জবাবে বলেন, স্বামী তো আমার আছে। আর সন্তান আমার থেকে জন্ম হয়েছে। তবে ভাইকে আমি হারিয়ে ফেলেছি, তাই আমি ভাইকেই গ্রহণ করলাম। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললেন, তার এই সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। (মুহাদারাতুল উদাবা : ১/৪৩৪)

তাই ভাইদের কর্তব্য বোনদের দায়িত্বের প্রতি সর্বদা সচেষ্ট হওয়া। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় বোনদেরর পাশে থাকা। বিশেষভাবে বাবার অপারগতা বা তার অবর্তমানে বোনের লালন-পালন, উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়াও ভাইয়ের দায়িত্ব। (বুখারি, হাদিস : ৫১৩০)

এমনকি ঘরে যদি ছোট বা অবিবাহিত বোন থাকে তাদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা। কোনোভাবেই যেন তারা কষ্ট না পায়; বরং নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে হলেও বোনদের ভালো রাখার চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে জাবের (রা.)-এর একটি ঘটনা খুবই স্মরণীয়। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবের, তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না; বরং অকুমারী। তিনি বলেন, কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? সে তো তোমার সঙ্গে আমোদ-ফূর্তি করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার আব্বা উহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। রেখে গেছেন ৯ মেয়ে। এখন আমার ৯ বোন। এ কারণে আমি তাদের সঙ্গে তাদের মতো একজন আনাড়ি মেয়েকে এনে একত্র করা পছন্দ করিনি; বরং এমন একটি নারীকে (পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। তিনি বলেন, ঠিক করেছ। (বুখারি, হাদিস : ৪০৫২)

তাই দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান ও সফল হতে চাইলে আত্মীয়তা রক্ষা; বিশেষভাবে বোনদের হক ও মর্যাদা রক্ষার বিকল্প নেই।

সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'আমি নবী করিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার রিজিক প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।' (বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাই-বোনের মর্যাদা রক্ষা করার তাওফিক দান করুন।

অধ্যায় ১৮ ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও সম্পর্কের সৌন্দর্য:

সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে পরিবার। আর এই পরিবার গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যেমন আইন-নীতিমালার প্রয়োজন হয় তেমনই স্বামী-স্ত্রীর বাঁধানো ছোট সংসারে নৈতিক বিষয়াবলি থাকা প্রয়োজন।

দাম্পত্যজীবন সুখকর ও আনন্দঘন করার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর কিছু দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর হক নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের হক রয়েছে।’ (সুরা আল বাকারাহ-২২৮)

স্বামীর হক

দাম্পত্যজীবন সুখকর ও আনন্দঘন করার জন্য স্ত্রীর ওপর স্বামীর কিছু হক রয়েছে। যথা,

সতীত্ব রক্ষা করা:

সুসন্তান লাভ ও পারিবারিক সুখ-শান্তি স্ত্রীর সতীত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। একজন সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য বড় নিয়ামত। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘পৃথিবীর সবকিছু উপভোগের জিনিস, তবে পৃথিবীর উপভোগের জিনিসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সতীসাধ্বী স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীর স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করা আবশ্যক।

আনুগত্যশীলা হওয়া:

স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্যশীলা হতে হবে। পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুন্দর রাখার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আমি যদি কাউকে সিজদা করার হুকুম করতাম তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করার।’ (জামে তিরমিজি, রিয়াদুস সালেহিন, পৃষ্ঠা-১৪২)

আমানতের হিফাজত করা

স্বামীর আমানতের হেফাজত করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। যেমন- ধনসম্পদ, সতীত্ব, ইজ্জত-আব্রু, স্বামীর গোপনীয় বিষয়, কথাবার্তা, অঙ্গীকার প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব।

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, কোন নারী উত্তম? মহানবী (সা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, ‘যে নারীর প্রতি স্বামী নজর করলে সে স্বামীকে আনন্দ দান করে, স্বামীর কথামতো চলে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং স্বামীর মতের বিরুদ্ধে তার সম্পদ ব্যয় করে না।’ (সুনানে নাসায়ি, পৃষ্ঠা-১৪২)

স্ত্রীর হক

স্ত্রীর যেমন স্বামীর প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তদ্রূপ স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক হলো-

সদাচরণ করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন- ‘আর (হে স্বামীরা) তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে।’ (সূরা নিসা-১৯)

মহানবী (সা.) বলেন, ‘সাবধান! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ রক্ষা করে চলবে। কারণ তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তোমরা তাদের মালিক নও। তারা তোমাদের স্পষ্ট অবাধ্যতা অবলম্বনের আগে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের কোনো অধিকার তোমাদের নেই। সাবধান! তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের হক রয়েছে। তোমাদের ওপর তাদের পাওনা হক হলো- তোমরা তাদেরকে সুন্দররূপে পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে।’ (জামে তিরমিজি, রিয়াদুস সালেহিন, পৃষ্ঠা-১৩৯)

ধৈর্যধারণ:

যদি স্ত্রীর কোনো অভ্যাস কিংবা আচরণ অপছন্দ হয় অথবা সুন্দর না হয় তবে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীল হতে হবে। স্ত্রীর অন্যায় ও অশুভ আচরণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সামান্য ভুলত্রুটির কারণে তালাক বা সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত হবে না।

রসুল (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুমিন স্বামী মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি তার একটি অভ্যাস অপছন্দ হলেও অন্য আরেকটি পছন্দ হয় এবং তাকে খুশি করে।’ (মুসলিম)

ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা :

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মু’মিনরা! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকো। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’ (সূরা তাগাবুন-১৪)

মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী তারা, যারা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ তারা, যারা স্বীয় স্ত্রীদের দৃষ্টিতে উত্তম বলে বিবেচিত।’ (জামে তিরমিজি-২৮৩)

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা আল্লাহর আমানতস্বরূপ তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গের বৈধতা লাভ করেছ। তোমাদের জন্য তাদের দায়িত্ব হলো তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে স্থান দেবে না, যা তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদেরকে হালকা প্রহার করো। আর তোমরা যথাযথভাবে তাদের অন্ন, বস্ত্র প্রদান করবে।’

জনৈক সাহাবি মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করেন, আমাদের ওপর স্ত্রীদের হক কী? রসুল (সা.) বলেন, ‘তুমি খেলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধান করাবে। চেহারায় প্রহার করবে না এবং ঘরে রাখবে, ঘর থেকে বের করবে না।’

রসুল (সা.) আরো বলেছেন, ‘স্ত্রীদেরকে প্রহার করবে না। যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা ভালো স্বভাবের মানুষ নয়।’ (আবু দাউদ) মহানবী (সা.) অপর হাদিসে বলেছেন, ‘যদি কারো দুজন স্ত্রী থাকে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার না করে, তবে সে বিচার দিন অর্ধেক দেহ নিয়ে উঠবে।’ (তিরমিজি)

অধ্যায় ১৯ : ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার ও সৌন্দর্য:

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। কাজেই এই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা যরূরী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। এ নিবন্ধে প্রতিবেশীর অধিকার সমূহ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রতিবেশীর পরিচয় : প্রতিবেশীর আরবী প্রতিশব্দ (জার) এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ Neighbour. পারিভাষিক অর্থে- A person who lives next to you or near you. 'তোমার পরে বা পার্শ্বে বসবাসকারী লোক।

ইবনুল মানযূর বলেন, 'প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি আইনত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী।

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা : কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- (১) হাসান (রাঃ) বললেন, নিজের ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)। (২) কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। (৪) যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। (৫) কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়।

প্রতিবেশীর প্রকার : দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার : ১. নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২. দূরবর্তী প্রতিবেশী *(নিসা ৪/৩৬)*। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা- ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী।

আচার-আচরণের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী দুই প্রকার। ১. উত্তম প্রতিবেশী ও ২. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ’।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট সেই সাথী উত্তম, যে তার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম’।

পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট প্রতিবেশী হ’তে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করতেন এই বলে, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হ’তে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে’।

প্রতিবেশী সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ : প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিবরীল (আঃ) বার বার তাকীদ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ’ত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন’।

উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার : প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া যরূরী। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

‘আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না’ (নিসা ৪/৩৬)। এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা প্রতিবেশীরাই মানুষের বিপদ-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই এসব লোকের সাথে ভাল আচরণ করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে’।

অন্যত্র তিনি বলেন ‘তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ’লে তুমি মুমিন হ’তে পারবে’।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মধ্যেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা নিহিত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে সে যেন সদা সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিবেশীর উপকার করে’।

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া : সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ও সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা যরূরী। নিজেকে নিয়ে যে সদা ব্যস্ত থাকে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত যে অন্য কিছুই ভাবে না, প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ’তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ ُيُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَه ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা পাপ। এমনকি তা ঈমানহীনতার পরিচায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না’।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না’।

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হ’ল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী’।

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা : প্রতিবেশীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা এতে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

- 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ করা হবে'।

প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য না করা : প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এবং কষ্ট দানকারীকে ঈমানহীন বলে অভিহিত করেছেন। এরপরও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এমর্মে বর্ণিত হয়েছে, আবু আমের হিমছী বর্ণনা করেন, ছাওবান (রাঃ) প্রায়ই বলতেন,

যখন দু'ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন তাদের একজনের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর যদি দু'জনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয়। আর যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া : উপহার আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'পরস্পরকে উপহার দাও। এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।

হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,- অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট উপঢৌকন পাঠাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যার দরজা (বাড়ী) তোমার বেশী নিকটবর্তী'।

বাড়ীতে ভাল কোন খাদ্য বা তরকারী পাক হ'লে তাতে প্রতিবেশীকে শরীক করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আবু যর! যখন কোন তরকারী পাক করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও'।

অন্য বর্ণনায় আছে,

'যখন ঝোল পাকাবে তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করবে ও তা তাদেরকে সদিচ্ছা সহকারে বিতরণ করবে'। তিনি আরো

বলেন, 'যখন ঝোল পাকাও, তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে'।

প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক না কেন সকলেই উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী। বাড়ীতে কোন ভাল জিনিস তৈরী হ'লে কিংবা পশু-পাখি যবেহ করা হ'লে তার গোশ্ত মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় বিধর্মী প্রতিবেশীর বাড়ীতেও প্রেরণ করা উচিত। একবার আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর বালক ভৃত্য একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, হে বৎস! কাজ শেষ করে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী হ'তে (গোশ্ত বিতরণ) শুরু করবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে উঠল, কি ইহুদী? আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে শুনেছি।

প্রতিবেশীর জন্য নিজের পসন্দনীয় বস্তু এখতিয়ার করা : নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পছন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন, **وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه**- 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা প্রতিবেশী অথবা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে'।

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে ভুরিভোজ না করা : দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আবার ধনী-দরিদ্রও আল্লাহ করে থাকেন। সুতরাং দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া আবশ্যক। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِه- 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।

প্রতিবেশীর দাওয়াত কবুল করা : সমাজের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আন্তরিকতা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। আর পরস্পরকে দাওয়াত দিলে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। দাওয়াত কবুল করা রাসূলের নির্দেশও বটে। তিনি বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. 'যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয় বা দাওয়াত কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হ'লে সে খাবে আর না হ'লে সে ছেড়ে দিবে'।[26] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاء. 'যখন

তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য আহবান জানানো হয়, তখন সে তাতে সাড়া দিবে। যদি সে ছায়েম হয়, তাহ'লে সে দো'আ করবে'

মুসলমানের ছয়টি হকের অন্যতম হচ্ছে দাওয়াত কবুল করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টা হক আছে। বলা হ'ল সেগুলি কি হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিবে; তোমাকে দাওয়াত দিলে কবুল করবে; পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবে; হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে'।

প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা : প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা ইসলামের নির্দেশ। এমনকি নিজের কিছুটা ক্ষতি হ'লেও প্রতিবেশীর সুবিধা করে দেওয়া ও তার অসুবিধা না করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه 'এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে'।

প্রতিবেশীর জান-মাল, ইয্যত-আব্রু হেফাযত করা : প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন যরূরী, তেমনি মাল-সম্পদ হেফাযত করাও অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه 'মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপত্তা লাভ করে'।

অন্য হাদীছে এসেছে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, (তা কেমন? উত্তরে) তারা বললেন, হারাম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্ত-সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর'।

প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা : মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ভাল এবং মন্দগুণের সমন্বয়ে মানুষ। প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দোষ গোপন রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 'যে ব্যক্তি

দুনিয়াতে কারো দোষ গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন'।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন'। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِىْ بَيْتِه- 'যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ক্রটি গোপন রাখবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। আর যে মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তাকে অপদস্ত করবেন তার ঘরের ভিতরে'।

প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা ও তাকে কর্যে হাসানা প্রদান করা :

পার্থিব জীবনে মানুষ অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। এজগতে কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং সে কোন না কোন ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী। প্রতিবেশীর কাজে সাধ্যমত সহায়তা করা তার প্রতি দয়ার বহিঃপ্রকাশ। আর মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহে সমাজ সুন্দর হয়; আল্লাহর রহমত লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاس 'আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না'।

প্রতিবেশী কখনও সমস্যায় পড়লে কর্যে হাসানা দিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত। তাকে কর্যে হাসানা দিয়ে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারীকেও সাহায্য করবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আললাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।

প্রয়োজনে প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা। এটা এমন একটি সৎকাজ যার কারণে আল্লাহ দাতাকে অনেক পুণ্য দান করে থাকেন। এর ছওয়াব বহুগুণ হয় এবং এর দ্বারা অপরাধ ক্ষমা করা হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ

قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ‘যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন’ *(তাগাবুন ১৭)*। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সাধ্যমত অভাবী প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা।

কর্যে হাসানার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ‘ছাদাক্বার ছওয়াব দশগুণ এবং কর্যে হাসানার ছওয়াব আঠারগুণ’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ‘যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু’বার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করে দেয়ার সমান ছওয়াব লিখা হবে’।

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, - ‘এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’।

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ- ‘যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি দান করুন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়’।

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ- ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি দিবেন’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ- ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় তাকে ছায়া দান করবেন’।

প্রতিবেশীর অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া ও সেবা করা : রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হ’লে মানুষ অসহায় ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কোথাও যেতে পারে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার সময় কেটে যায়। এমতাবস্থায় কেউ পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দিলে সে স্বস্তি বোধ করে। অনুরূপভাবে অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে গেলে তাকে সে আপন

মনে করে। তাছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। রোগীর দেখা-শোনা ও সেবা-শুশ্রূষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِى- 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।

অন্যত্র তিনি বলেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা বিরাট পূণ্যের কাজও বটে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِع 'কোন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে গেলে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহবানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ'।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

যে কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে গেলেই তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।

প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা দেওয়া : প্রতিবেশীর যে কোন দুঃখ-শোকে তার পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন'।

প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ : এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে ছয়টি হক রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হ’ল কেউ ইন্তিকাল করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, আহবানে সাড়া দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া’।

জানাযায় অংশগ্রহণে প্রতিবেশীর হক যেমন আদায় হয়, তেমনি এতে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার জানাযার ছালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রতিটি ক্বীরাত হ’ল ওহোদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’।

প্রতিবেশীর মৃত্যু হ’লে তার পরিবারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ’ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মু’তার যুদ্ধে জা‘ফর (রাঃ) শহীদ হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ ‘তোমরা জা‘ফরের পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর। কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে’।

প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার : কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)

আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তা নবী করীম (ছাঃ)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে

রাখ। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এর উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে তখন বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না'।

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন,

একদা এক ব্যক্তি এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, যাও তোমার দ্রব্য-সামগ্রী উঠিয়ে রাস্তায় রেখে দাও। তখন যে রাস্তা অতিক্রম করবে, সে তাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তা-ই করল)। ফলে রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীটিকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'ল। তখন তিনি বললেন, লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলে? এরপর তিনি বললেন, লোকজনের অভিসম্পাতের পরও রয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাত। অতঃপর অভিযোগকারীকে বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। অথবা তিনি অনুরূপ বললেন।

প্রতিবেশীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা : প্রতিবেশীদের মাঝে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহর নির্দেশ, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' (হুজুরাত ৪৯/১০)। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَىْ أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়ছালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন' (হুজুরাত ৪৯/৯)।

বিবাদ মীমাংসা করা শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ 'আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. 'বিবাদমান বিষয়ে মীমাংসা করা'।

মুসলিম ভাইদের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করে দিলে ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ 'তোমার দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়ছালা করা একটি ছাদাক্বা'।

প্রতিবেশীকে হত্যা করা ক্বিয়ামতের আলামত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলেছেন এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। অথচ বর্তমানে তুচ্ছ কারণে মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা পর্যন্ত করছে। এটা ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاه- 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং পিতাকে হত্যা করবে'।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যধিক। তাদের সাথে সদাচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা রাসূলের নির্দেশ। খাদ্য আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া দুষ্কর হবে।

তাছাড়া সমাজকে সুন্দর করার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং তার সাথে সদাচরণ করা যরূরী। এতে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। প্রতিবেশীর হক আদায় করলে পার্থিব জীবনে উপকারের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব অর্জিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে প্রতিবেশীর হক আদায় করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

অধ্যায় ২০: ইসলামে বন্ধুত্বের গুরুত্ব কতটা ও সৌন্দর্য:

স্বভাবতই আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, তা আমরা অন্তর্মুখী হই বা বহির্মুখী। বন্ধুত্ব আমাদের ঈমান, জীবনের পরীক্ষা মোকাবিলা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোরআন ও হাদিসে বন্ধুত্বের গুরুত্ব এবং ভালো বন্ধু নির্বাচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'মুমিনরা পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পারো।' (সুরা হুজুরাত, আয়াত: ১০)

ইসলামে বন্ধুত্বের মাত্রা

ইসলামে বন্ধুত্ব কেবল একটি সামাজিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। তাই তোমরা কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ, তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করো।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস: ৪,৮৩৩)

অর্থাৎ, ভালো বন্ধু নির্বাচন আমাদের ঈমান ও জীবনধারায় গভীর প্রভাব ফেলে। তাকওয়া বা আল্লাহভীতিসম্পন্ন বন্ধু আমাদের আল্লাহর পথে চলতে উৎসাহিত করে।

হজরত আলী (রা.) বলেছেন, 'যতটা সম্ভব সত্যিকারের বন্ধু তৈরি করো। কারণ, তারা সুখের সময়ে সঙ্গী এবং দুঃখের সময়ে আশ্রয়।' (নাহজুল বালাগাহ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৯, পৃ. ৫৬৭)

অধ্যায় ২১: ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার এবং সৌন্দর্য:

শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধর্ম ইসলাম শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম শ্রমের প্রতি যেমন মানুষকে উৎসাহিত করেছে, তেমনি শ্রমিকের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পূর্ণ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।' (সুরা : জুমুআ, আয়াত : ১০)

অত্র আয়াতে আল্লাহ ফরজ নামাজ আদায়ের পর রিজিকের সন্ধানে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদিস শরিফে এসেছে, 'ফরজ ইবাদতগুলোর পর হালাল উপার্জন ফরজ দায়িত্ব।' (তিরমিজি)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'হালাল উপার্জনগুলোর মধ্যে তা সর্বোত্তম, যা কায়িক শ্রম দ্বারা অর্জন করা হয়।

' (মুসলিম)

অন্য হাদিসে এসেছে—'নিজ হাতের শ্রমে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম আহার কেউ কখনো গ্রহণ করেনি।'

(বুখারি, হাদিস : ২০৭২)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ যারা মানুষের সুখের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদের তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়, তারা তো মহান আল্লাহর কাছেও মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য আর নেই।

আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন।'

(বুখারি, হাদিস : ২৭৫৯)

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বদ্ধপরিকর। আর একজন শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অধিকার বা দাবি হলো, তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'

(ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২৪৪৩)

মালিকের করণীয়

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হবে পিতা-সন্তানের মতো।

নিজের পরম আত্মীয়ের মতোই শ্রমিকের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা, পরিবারের সদস্যদের মতোই তাদের আপ্যায়ন করা, শ্রমিকের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি মালিকের খেয়াল রাখা এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করা মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রমিককে তার প্রাপ্য পূর্ণভাবে যথাসময়ে প্রদান করাও মালিকের একটি প্রধান দায়িত্ব। অনেক সময় শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকরা উপযুক্ত মজুরি না দিয়ে যৎসামান্য মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চিত করেন। এ ধরনের মালিকদের সম্পর্কে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তাদের মধ্যে একজন হলো—যে শ্রমিকের কাছ থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে অথচ তার পূর্ণ মজুরি প্রদান করে না।' (বুখারি, হাদিস : ২৯৮৪)

শ্রমিকের কর্তব্য

অন্যদিকে একজন শ্রমিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ ওই শ্রমিককে ভালোবাসেন যে সুন্দরভাবে কার্য সমাধা করে।'

(সহিহুল জামে, হাদিস : ১৮৯১)

কিন্তু কোনো কোনো শ্রমিক মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ জন্য তাকে কিয়ামতের মাঠে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আর যদি শ্রমিক তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে, তাহলে তার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে বলেন, 'তিন শ্রেণির লোককে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো—ওই শ্রমিক যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও আদায় করে।'

(মেশকাত, হাদিস : ১১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, সৎ শ্রমিকের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'যেই সত্তার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ তাঁর কসম! যদি আল্লাহর রাস্তায়

জিহাদ, হজ ও আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ব্যাপারগুলো না থাকত, তাহলে আমি শ্রমিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পছন্দ করতাম।'
(বুখারি, হাদিস : ২৫৮৪)

শ্রমিকের জন্য আবশ্যক

শ্রমিকদের যে বিষয়টি মনে রাখা আবশ্যক তা হলো—বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে। সুতরাং মে দিবসে যেকোনো ব্যক্তির যানবাহন চালানোর বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট খোলা রাখারও অধিকার আছে। তাতে বাধাদানের অধিকার কারো নেই। কিন্তু আমাদের দেশে মে দিবসে যদি কেউ যানবাহন চালায় বা দোকানপাট খোলা রাখে তাহলে উচ্ছৃঙ্খল কিছু শ্রমিককে গাড়ি ভাঙচুর করতে এবং দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দিতে দেখা যায়, যা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে হরতাল-ধর্মঘটও বর্জন করা আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, এ সুন্দর পৃথিবীর

রূপলাবণ্যে শ্রমিকদের কৃতিত্বই অগ্রগণ্য। কিন্তু শত আক্ষেপ! সভ্যতার কারিগর এই শ্রেণি সর্বদাই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত। উদয়াস্ত উষ্ণ ঘামের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নিয়ে খেটে যে শ্রমিক তার মালিকের অর্থযন্ত্রটি সচল রাখে, সেই মালিকেরই অবিচারে শ্রমিকদের অচল জীবনটি আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এটাকে সেই মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা দীর্ঘ পরিশ্রমের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করে চাকে সঞ্চয় করে, কিন্তু তার ভাগ্যে এক ফোঁটা মধুও জোটে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিকের বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর এ জন্য সর্বাগ্রে উচিত ইসলাম প্রদর্শিত মালিক-শ্রমিক নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। আমিন!

অধ্যায় ২২: ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলতের সৌন্দর্য:

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। তাই সামাজিক জীবনে পরস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সমাজকল্যাণমূলক ধর্ম। মানব কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলাম ও সমাজকল্যাণ একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজকল্যাণ বলতে মানুষের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বুঝায়। আর ইসলাম মানুষকে অন্যের কল্যাণে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان، ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (মায়েদাহ ৫/২)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,‘(অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন,(অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন,(অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘আমি এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়‘আত গ্রহণ করেছি যে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করব’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْه، ‘আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে’।[3] এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইসলামে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইয়াতীম প্রতিপালন :

সমাজের সবচেয়ে অসহায় অবহেলিত, নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিরাপত্তাহীনভাবে দীনাতিপাত করে একজন ইয়াতীম শিশু। তাই সমাজকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বরে রয়েছে ইয়াতীম শিশু। মহান রাববুল আলামীন কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে ইয়াতীম শিশু প্রতিপালন, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, নিরাপত্তা দান, তাদের সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের প্রতি স্নেহ,

মায়া-মমতা ও সদাচরণের বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করে এটিকে অত্যন্ত নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ،

'(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামন্ডলী, আল্লাহর কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ، 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি অংশ ইয়াতীমদের জন্য নির্ধারিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، 'আর তোমরা জেনে নাও যে, যুদ্ধে তোমরা যে সকল বস্তু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তার এক পঞ্চমাংশ হ'ল আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য' *(আনফাল ৮/৪১)*।

ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا، 'ইয়াতীমদেরকে তাদের মালামাল বুঝিয়ে দাও এবং মন্দকে ভালো দ্বারা বদল করো না। আর তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই এটি গুরুতর পাপ' *(নিসা ৪/২)*। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ আরো কঠোর হুঁশিয়ার করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা

তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে। সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

জান্নাতী লোকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا، 'তারা আল্লাহর মহববতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*।

ইয়াতীম প্রতিপালনকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁকা করলেন'প্রায় অনুরূপ হাদীছ এসেছে ছহীহ মুসলিম ও সুনানে আবূদাঊদে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ، 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম ইয়াতীমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।

বিধবাকে সহায়তা দান :

সমাজের আরেক অসহায় শ্রেণীর নাম হচ্ছে বিধবা। বিশেষ করে দরিদ্র, নিঃস্ব, অবহেলিত বিধবা নারী। এমন বিধবাকে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবাদত তুল্য নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ، يَشُكُّ الْقَعْنَبِىُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ، 'যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটোছুটি করে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাও বলেছেন, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত ছালাত আদায় করে এবং সারা বছরই ছিয়াম পালন করে'।

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান :

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করার জন্য মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকীদ দিয়েছেন। জান্নাতের প্রবেশের ঘাঁটির সন্ধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ، ‘অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা, ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে’ *(বালাদ ১৪-১৬)*।

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হ’ল তারা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিঃস্ব-দরিদ্র, ইয়াতীম ও কারাবন্দীদেরকে খাদ্য দান করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيْرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ‘তারা আল্লাহর মহববতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না’ *(দাহর ৭৬/৮-৯)*। কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হ’ল- অভাবীদেরকে খাদ্য দান না করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ، فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، ‘তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে? সে হ’ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়, এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না’ *(মাঊন ১০৭/১-৩)*। অভাবীদেরকে খাদ্য দান না করা জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যও বটে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، ‘কোন বস্তু তোমাদেরকে ‘সাকারে’ প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪২-৪৪)*।

যারা অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে না হাশরের দিনে আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিবেন তাদের গলায় রশি লাগিয়ে টেনে হিছড়ে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে। আল্লাহ বলেন, خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، ‘(তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) শক্তভাবে ধরো ওকে। অতঃপর (হাত সহ) গলায় বেড়ীবদ্ধ করো ওকে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে। অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে। সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩০-৩৪)*।

অভাবগ্রস্ত, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান না করলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই শাস্তি স্বরূপ তাদের সম্পদ কমিয়ে দেন অথবা ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ، وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ، أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّوْنَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُوْنَ، قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُوْنَ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ-َ

'আমরা তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে। কিন্তু তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ঐ বাগিচার উপর এক আসমানী গযব আপতিত হ'ল, যখন তারা নিদ্রামগ্ন ছিল। ফলে তা পুড়ে কালো ভস্মের ন্যায় হয়ে গেল। অতঃপর তারা প্রত্যুষে উঠে পরস্পরকে ডেকে বলল, যদি তোমরা ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চল। অতঃপর তারা চলল চুপিসারে কথা বলতে বলতে, যেন আজ বাগিচায় তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত প্রবেশ না করে। অতঃপর তারা দ্রুতপায়ে খুব ভোরে যাত্রা করল। কিন্তু যখন তারা বাগানের চেহারা দেখল, তখন বলল আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি, যদি না তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলতে)! তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা নিশ্চিতভাবে সীমালংঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা অবাধ্য ছিলাম' *(ক্বালাম ৬৮/১৭-৩১)*। নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো ইসলামের উত্তম আমল। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَام،َ

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, 'তুমি (অভাবীকে) খাদ্য খাওয়াবে'। প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটপুরে খাওয়া কোন মুমিনের কাজ নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ, 'সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ইসলামের অন্যতম সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগীর সেবা করা ও দেখতে যাওয়া :

রোগীর সেবা করা বা রোগীকে দেখতে যাওয়া ইসলামের অন্যতম সমাজকল্যাণমূলক ও পুণ্যময় কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে এক মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের হক্ব বা অধিকার বলে অভিহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ. 'একজন মুমিনের ওপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- ১. যখন কোন মুমিনের রোগ-ব্যাধি হয়, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করা ২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযাহ ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া ৩. কেউ দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করা অথবা কারো ডাকে সাড়া দেয়া ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা ৫. হাঁচি দিলে জবাব দেয়া এবং ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুমিনের কল্যাণ কামনা করা'।

রোগীকে দেখতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِى 'ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ 'অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, জানাযায় অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।

অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা না করলে বা দেখতে না গেলে এর জন্য হাশরের দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَه، 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কি করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি

জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বৈধ ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْه، 'তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে'।

যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করে বা দেখতে যায় তার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا- 'কোন ব্যক্তি যখন রোগীকে সেবা করে বা দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের উদ্যানে ফল আহরণ করতে থাকে। বলা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! 'খুরফা' কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল'।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا 'যে ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ، 'এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, অথচ তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ فِى الْجَنَّةِ مَنْزِلاً 'যখন কোন মুসলিম তার কোন ভাইয়ের রোগ দেখতে যায় অথবা সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার জীবন সুখের হ'ল, তোমার চলন উত্তম হ'ল এবং তুমি জান্নাতে একটি ইমারত বানিয়ে নিলে'।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা :

প্রতিবেশী হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে নিকটজন, যিনি তার খবরা-খবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশী জানেন। সুখ-দুঃখ, বিপদাপদে প্রতিবেশীই সবার আগে এগিয়ে আসে। তাই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন

এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা, তাদের বিপদাপদে এগিয়ে যাওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা সুখী-সমৃদ্ধশালী, সুশৃংখল, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের বিকল্প নেই। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ‘আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُه، ‘জিবরীল (আঃ) সদা-সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন’। প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করলে সে কখনো পূর্ণাঙ্গ মুমিন হ’তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه. ‘আল্লাহর ক্বসম সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর ক্বসম সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর ক্বসম সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه، ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’।[22] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَه، ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়’।

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে খাদ্য না দিয়ে যে ব্যক্তি পেটপুরে খায় সেও প্রকৃত মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِه، ‘ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ، 'তোমরা যখন তরকারী রান্না করবে, তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে।

কর্যে হাসানাহ :

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্যে হাসানাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। চির অভিশপ্ত সূদী কারবারকে প্রতিহত করতে হ'লে কর্যে হাসানার বিকল্প নেই। সামাজিক দৈন্য, পারিবারিক কলহ সহ নানা অসংগতি দূরীকরণে কর্যে হাসানাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়করণ, দারিদ্রবিমোচন, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ সহজেই দূর করা সম্ভব।

কর্যে হাসানাহ প্রদান সাধারণ দান-ছাদাক্বার ন্যায় নেকআমল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً، 'যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু'বার ঋণ দান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করার ন্যায় হবে'।[26] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِى مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ 'নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থ দান ছাদাক্বার অর্ধেক'।[27] তিনি আরো বলেন, كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক কর্যে ছাদাক্বার ছাওয়াব রয়েছে'।

ক্ষেত্র বিশেষে দান-ছাদাক্বার চেয়েও কর্যে হাসানার ছওয়াব বেশী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ 'জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় লিখিত দেখতে পেল যে, ছাদাক্বায় দশগুণ (ছওয়াব) এবং ঋণদানে আঠারগুণ (ছওয়াব রয়েছে)'।

অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে সহজ ব্যবস্থা করে দিলে বা ক্ষমা করে দিলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، 'যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক সে যেন ঋণগ্রস্ত অক্ষম লোককে সহজ ব্যবস্থা করে দেয় কিংবা ঋণ মওকূফ করে দেয়'।[30] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه، 'যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অভাবী লোককে সুযোগ দিবে অথবা (সম্পূর্ণ বা কিছুটা ঋণ) মওকূফ করে দিবে, ক্বিয়ামত

দিবসে আল্লাহ তাকে তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না'।

তিনি আরো বলেন,مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন'।[32]

ঋণগ্রস্ত অক্ষম ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য সময় দিলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছওয়াব পাওয়া যায়। বুরায়দা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

'যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। এরপর তাকে বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে দ্বিগুণ পরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। আমি বললাম, আপনাকে বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। এরপর বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে দ্বিগুণ পরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। তখন তিনি বললেন, কেউ যদি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কিছু সময় দেয় তাহ'লে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ একবার ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাবে যতক্ষণ না ঋণ আদায়ের সে নির্ধারিত দিন এসে যায়। উক্ত নির্ধারিত দিন এসে যাওয়ার পর যদি সে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দেয় তাহ'লে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ দু'বার ছাদাক্বা করার ছাওয়াব পাবে'।

ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِىَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْه، 'পূর্ব যুগের জনৈক লোক মানুষকে ঋণ দান করত। আর সে তার চাকরকে (কর্মচারীকে) বলত, অভাবী ঋণগ্রস্ত কোন লোকের কাছে (ঋণের অর্থ আদায় করতে) গেলে তাকে ক্ষমা করে দিও। আশা করা যায় আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এরপর মৃত্যুবরণ করে সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করল। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।

ত্রাণ বিতরণ :

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষ দুর্যোগে নিপতিত হয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নিঃস্ব হ'তে পারে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, নদী ভাঙ্গাসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যেকোন সংকটময় অবস্থায় অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদ সমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের বিপদসমূহের মধ্য হ'তে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন'।[36]

পৃথিবীর অধিবাসীদের বিপদাপদে, সংকটময় মুহূর্তে সাহায্যে এগিয়ে আসলে আসমানের অধিবাসী আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ، 'তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহ'লে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।

শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দান :

শরণার্থীর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Refugee তথা উদ্বাস্তু। Convention related to the status of Refugee এর অনুচ্ছেদ-১ এ বলা হয়েছে: 'শরণার্থী হ'ল এমন ব্যক্তি যারা ধর্ম, বর্ণ ভাষা, গোষ্ঠী বা জাতীয়তা বা সমাজের কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে, অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার সুনিশ্চিত ভয় থেকে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য দেশত্যাগ করে বা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে অন্য কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ ব্যক্তি যে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেটা তার সাধারণ বাসস্থান যেটা সাধারণ অবস্থার পরিপন্থী'।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শরণার্থীর বিষয়টি নতুন কোন বিষয় নয়। অতীতকাল থেকেই মানুষ নিজ জন্মভূমিতে বিভিন্ন কারণে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বিতাড়িত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্বাস্ত হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ মক্কার কাফির-মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়ে প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ মদীনায় হিজরত করেন। আল্লাহপাক ঈমানের বরকতে আনছাগণের মধ্যে এমন মহববত সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, মুহাজিরগণকে ভাই হিসাবে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে উদগ্রীব ছিলেন।

যদিও তাদের মধ্যে সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু তারা ছিলেন ঈমানী প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সবাই মুহাজিরগণকে স্ব স্ব পরিবারে পেতে চান। ফলে মুহাজিরগণকে আনছারদের সাথে ভাই ভাই হিসাবে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা তাদের জমি, ব্যবসা ও বাড়ীতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করে নেন। এমনকি যাদের দু'জন স্ত্রী ছিল, তারা একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুহাজিরগণের প্রতি এরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁরা ইতিহাসে 'আনছার' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মুহাজিরদের আশ্রয়দানকারী আনছারদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

কোন মানুষ নিজ মাতৃভূমিতে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিলে তাদেরকে কিভাবে আশ্রয় দিতে হয়, সাহায্য করতে হয় এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয় তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মদীনার আনছারগণ। এমন বদান্যতার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশ তথা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, বসনিয়া, আফগানিস্তান এবং সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের শরণার্থী সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করেছে। তাই এ সকল শরণার্থীদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيه 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاس 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি দয়া করেন না'।

রক্তদান :

রক্তদান হ'ল কোন প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৬০) সুস্থ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্ত দেয়ার প্রক্রিয়া। এই দান করা রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় অথবা অংশীকরণের মাধ্যমে ঔষধে

পরিণত করা হয়। রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রক্তদান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে অবস্থিত অস্থিমজ্জা নতুন রক্ত কণিকা তৈরীর জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং রক্তদান করার দুই/তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্ত কণিকার জন্ম হয়ে ঘাটতি পূরণ করে। অজ্ঞতার কারণে অনেকেই রক্তদানকে ক্ষতিকর মনে করে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। বছরে ৩ বার রক্তদান করলে শরীরে লোহিত কণিকাগুলো প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে তোলার সাথে সাথে নতুন রক্তকণিকা তৈরীর হার বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, রক্তদান করার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেহে রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বছরে দুইবার রক্ত দেয়। অন্যদের তুলনায় তাদের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বিশেষ করে ফুসফুস, লিবার, কোলন, পাকস্থলী ও গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্ষেত্রে অনেক কম পরিলক্ষিত হয়। নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্ত দানের মাধ্যমে নিজের শরীরে বড় কোন রোগ আছে কিনা তা বিনা খরচেই জানা যায়। যেমন- হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইচআইভি ইত্যাদি।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিয়মিত রক্তদান করে রক্ত সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলা উচিত। জনৈক কবি বলেছেন,

‘সময় তুমি হার মেনেছ রক্তদানের কাছে
দশটি মিনিট করলে খরচ একটি জীবন বাঁচে’।

উল্লিখিত পঙতি দু’টিতে কবি যথার্থ কথাই বলেছেন। রক্ত দান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতির ক্লু সৃষ্টি হয় মাত্র ১/২ ব্যাগ রক্ত হ’লেই আল্লাহর রহমতে রোগী বেঁচে যেতে পারে। কেননা রক্তের বিকল্প আজও কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। থ্যালাসেমিয়া রোগী, অপারেশনের রোগী, এ্যাক্সিডেন্টে রক্ত শূন্য হয়ে মৃত্যু পথযাত্রীসহ এমন সংকটময় মুহূর্তে মাত্র এক ব্যাগ রক্তের বিনিময়ে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বাঁচতে পারে একটি প্রাণ। আর এ প্রাণ বাঁচানো এমনই পুণ্যময় কাজ যে, মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন একজন লোককে বাঁচানোকে সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচানোর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ‘আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে’ *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيه ، ‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে’।

সাংগঠনিকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা :

সমাজ কল্যাণমূলক কাজগুলো এককভাবে ও সাংগঠনিকভাবে এ দু'প্রক্রিয়ায় করা যায়। তবে এককভাবে এগুলো করার চেয়ে সাংগঠনিকভাবে করলে এর সহজতা, উপকারিতা ও ফলাফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'রক্তদান' কর্মসূচী। কোন সাংগঠনিক প্রচার-প্রচারণা, কার্যক্রম না থাকলে অনেকেই রক্ত দানের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে পারে না বিধায় রক্তদানে উৎসাহী হয় না; এমনকি নিজের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কেও অনেকেই জানে না এবং রক্ত গ্রহীতাগণও সংকটময় মুহূর্তে জানতে পারে না কোথায় যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে নিরাপদ রক্ত পাওয়া যাবে। আবার এমন কিছু দুর্লভ গ্রুপের রক্ত রয়েছে যা সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই তারা বাধ্য হয় 'ব্লাড ব্যাংক' থেকে উচ্চমূল্যে বাসী ও মাদকাসক্তদের রক্ত সংগ্রহ করতে। ব্লাড ব্যাংকে যারা রক্ত বিক্রি করে তাদের ৯০% মাদকাসক্ত। কারণ মাদকাসক্তরা মাদক কেনার মত টাকা-পয়সা না থাকলে রক্ত বিক্রি করে হ'লেও তারা মাদক ক্রয় করে। আর একজন মাদকাসক্তের রক্ত মানেই বিভিন্ন রোগ জীবানুতে ভরপুর। এ ধরনের রক্ত শরীরে গ্রহণ করা মানেই রোগকে আমন্ত্রণ জানানো। পক্ষান্তরে সাংগঠনিকভাবে 'রক্তদান' মানেই সহজলভ্য বিনামূল্যে নিরাপদ ও তাজা রক্ত। উদাহরণ স্বরূপ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধীনে পরিচালিত 'আল-আওন' নিরাপদ রক্তদান কর্মসূচী। এটি এমন একটি 'রক্তদান' কার্যক্রম দেশের প্রায় প্রতিটি যেলা-উপযেলায় এর সদস্য রয়েছে।

এর প্রতিটি সদস্য দ্বীনদার, পরহেযগার বিধায় এদের রক্ত সম্পূর্ণই মাদকমুক্ত ও নিরাপদ। দেশব্যাপী রয়েছে এদের সদস্যের নেটওয়াক। দেশের যেকোন প্রান্তেরই সংকটময় মুহূর্তে উক্ত সংগঠনের যেকোন দায়িত্বশীল বা কর্মীর সাথে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে নিরাপদ রক্ত পাওয়া যায়। রক্তদাতা স্রেফ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রক্তদান করে থাকেন। উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে কুরআন-হাদীছ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে রক্তদানের গুরুত্ব, তাৎপর্য, উপকারিতা ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে জনসচেনতা সৃষ্টি করা হয়।

অনুরূপভাবে ইয়াতীম প্রতিপালন, বিধবাকে সহায়তা দান, নিঃস্ব, দরিদ্রকে খাদ্য-অর্থদান, কর্যে হাসানাহ, ত্রাণ বিতরণ, শরণার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্য করা ইত্যাদি

ব্যক্তিগতভাবে করার চেয়ে সাংগঠনিকভাবে করলে এর উপকারিতা ও ফলাফল সুদূর প্রসারী।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানব কল্যাণকামী ধর্ম। তাই ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোকে ইবাদততুল্য কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এতে রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি। তাই প্রত্যেকটি মুসলিমের উচিত এ সকল সমাজকল্যাণ মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাত লাভের পথকে সুগম করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এ মহান কাজে ব্রতী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

অধ্যায় ২৩: ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদবের সৌন্দর্য:

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَا- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন -من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২।দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪। ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন- باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل. (সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রূপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

কুরআন-সুন্নাহয় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন- وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহ্ল (১৬) : ৪৪।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয়

কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২) : ২। সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন- يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا. হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০) সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন- هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬) হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন- رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا. হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪)আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২।প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি

আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন- مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ. ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না? আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমে দ্বীনের ফযীলত : সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫। অপর এক

আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْن.বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯।

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين.আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭।আরো ইরশাদ করেছেন- لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬।অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন- مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة. যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِع. যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭। অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে- مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ

يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله. যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯।

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه. যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১।

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭।নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা:

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই

সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে- مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪।

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّار.তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন- لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه. পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ‚ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি :কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল

(নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلّمِ. ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন- وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ. ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে- فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর ‘আলমুআফাকাত’ গ্রন্থে লিখেছেন- قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ. আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন- إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم. এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّم.তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ!

নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।
একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ: ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْه.শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয়: ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮। সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায় অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন- لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ. অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। -সহীহ বুখারী ১/৩৮। লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮। আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা: কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা

২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-.আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও 'উলুল ইলম'ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, 'উলুল ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য- মুমিনদের আলেমগণ।ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭। প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-. নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূ্ূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫।হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় এফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১। দ্র. কেউ কেউ এই হাদীসের -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/১৮৩; মেরকাতুল মাফাতীহ ১/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়) আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনী ইলম অর্জনের তাওফীক দিন।

অধ্যায় ২৪: আমাদের করণীয় কিভাবে ইসলামের সৌন্দর্য আমরা ফুটিয়ে তুলবো :

মুসলমান হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো—আন্তরিক ইবাদতের পাশাপাশি সৎ চরিত্র, ইনসাফ, এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বাস্তব চর্চা করা। লেনদেনে সততা, ওয়াদা রক্ষা, এবং কথাবার্তায় কোমলতা ও সত্যবাদিতা বজায় রাখা। মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্রই মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য । পিতা-মাতার সেবা করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা । ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সর্বদা ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা, এমনকি নিজের বা আত্মীয়ের বিপক্ষে গেলেও সত্যের পথে অটল থাকা পোশাক-আশাকে শালীনতা বজায় রাখা। এবং ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পরিবেশের সুরক্ষায় পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য চর্চা করা ।

আমাদের প্রতিটি কাজের মাধ্যমে যখন মানুষ সততা, ন্যায় ও মানবতার প্রতিফলন দেখবে, তখনই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবার সামনে ফুটে উঠবে।

আধুনিক যুগে ইসলামের সৌন্দর্য কথা ও কাজের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং অমুসলিমদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়া ।প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সততার জন্য 'আল-আমিন' উপাধি পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সবসময় সত্য বলা ও ওয়াদা রক্ষা করা। অন্যের সাথে কথা বলার সময় নম্রতা বজায় রাখা। অহংকার ও কঠোরতা পরিহার করে হাসিমুখে কথা বলা। অসহায় ও দুস্থদের সাহায্য করা ইসলামে মানবসেবাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

ইসলাম শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে মুসলিমরা সমাজের উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক বলেছে। নিজের পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি ও চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে রুচিশীল জীবনের পরিচয় দেওয়া।

মুসলিমদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা ঝগড়া-বিবাদ না করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এবং ক্ষমা ও উদারতার সাথে সমাধান করা এবং আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের (সা:) দিকে ফিরে আসা।
বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মুসলিমদের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা। ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে বোঝানোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো নিজের সুন্দর আচরণ। আপনার সততা ও ব্যবহার দেখে যেন অন্য ধর্মের মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্তমান যুগে ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে ইসলাম বিদ্বেষমূলক কথার হেকমার সাথে প্রতিবাদ করা, ইসলামের শান্তির বাণী ও সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরা।

- ***উপসংহার***

"পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের সৌন্দর্য কেবল নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার বা বিশ্বাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত এক পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদর্শন। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা দেখেছি, কীভাবে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ—ব্যক্তিগত সততা, সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং আত্মিক প্রশান্তি—আধুনিক বিশ্বের জটিল ও অস্থির পরিস্থিতির মাঝেও এক সুশৃঙ্খল পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।
আমরা এই থিসিসের বিভিন্ন অধ্যায়ে পর্যালোচনা করেছি যে, ইসলাম কীভাবে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ ও পরিবার রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সুন্দর করে তোলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে নৈতিকতার সাথে সংযুক্ত করে, কীভাবে এটি সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে এবং কীভাবে এটি পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে আমাদের আগামীর পৃথিবীর জন্য টেকসই সমাধানের ইঙ্গিত দেয়। আধুনিক মানুষের একাকীত্ব, মানসিক অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের সংকটের দিনে ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা এক ওষুধের মতো কাজ করে।
ইসলাম কোনো স্থবির ব্যবস্থা নয়, বরং এটি সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক জীবনবিধান। আমাদের এই আলোচনার মূল নির্যাস হলো—যদি ইসলামের মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে সঠিকভাবে চর্চা করা যায়, তবেই ব্যক্তিমানুষ তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন হবে এক শান্তিময়

ও কল্যাণকামী। আমাদের মুসলিমদের উচিত ইসলামের সুন্দর দিক গুলো অমুসলিমদের সামনে তোলে দরা। নিজের ব্যাক্তি জীবনে রাষ্টে পরিবারে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা।পরিশেষে, ইসলাম মানবতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক আলোকবর্তিকা, যা যুগের সীমানা পেরিয়ে মানুষকে সত্য, ন্যায়ের পথে এবং প্রকৃত স্বাধীনতার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়।” আল্লাহ আমার মা-বাবা স্ত্রী সন্তান পরিবারের সকলের উপর রহম করুন আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

- ***মৌলিক উৎস***
- ***আল কোরআন***
- **মাসিক আলকাউসার** https://www.alkawsar.com
- **ইসলামের সৌন্দর্য বই লেখক মূল: আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নসের সাদি (রহ:)**
- **শিবির অনলাইন লাইব্রেরি** https://www.icsbook.info
- **মুসলিম বাংলা** https://muslimbangla.com
- **বাংলাদেশ প্রতিদিন** bd-pratidin.com
- **মাসিক আত-তাহরীক** https://at-tahreek.com
- www.Islamhouse.com
- **কালের কণ্ঠ** https://www.kalerkantho.com
- **এবং অন্যান্য মাধ্যম।**